আবৃত–ইতিহাস উনকোটি

জয়ন্তনাথ চৌধুরী

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী :: কলিকাতা ৬

ĀBRITA ITIHĀS UNAKOTI

Jayantanath Choudhury

Price Rs. 4·00

প্রকাশক
শ্রীমতী সুলতা সরকার
১নং জেল রোড—ঈস্ট
খারপাকনা
রাঁচি

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা : চারু খান

প্রথম প্রকাশ :
ফাল্গুন ১৩৭৬

দাম পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর
[illegible] প্রেস
[illegible] ভট্টাচার্য
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

যাঁরা আজ আর নেই,—

কিন্তু, সবার চেয়ে সুখী হতেন······

মা বাবা

আর

দিদি জামাইবাবুকে

আমার দীন প্রণাম ।

॥ নিবেদন ॥

উনকোটির বিষয়ে গ্রন্থরচনার চেষ্টা দূরে থাক—উনকোটি-দর্শন-ই সম্ভব হত না, যদি আমার সুহৃদ্ ও সহকর্ম্মী অধ্যাপক শ্রীমাণিক সাহা হৈ-হৈ করে একদিন উনকোটি যাবার সব ব্যবস্থা না করতেন। তাই প্রথমেই এই কথা বলে নিতে চাই যে, তাঁর উৎসাহেই উনকোটি-দর্শন সম্ভব হয়েছে। উনকোটি দেখে বিস্মিত হয়েছি একথা বলাই যথেষ্ট নয়—উনকোটি মুগ্ধ করেছে আমাকে, ভাবিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। অধ্যাপক শ্রীমাণিক সাহা এবং অধ্যাপক শ্রীশিউকুমার তেওয়ারী আমার সহকর্ম্মী বন্ধুরূপে এই গ্রন্থবচনায় বহুভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের দুজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

আমার আর একজন সহকর্ম্মী অধ্যাপক শ্রীহারাণচন্দ্র নিয়োগী। তাঁব কাছে আমার ঋণ অনেক। তিনি নিজে ইতিহাসের অধ্যাপক এবং সুপণ্ডিত্। প্রাচীন ইতিহাস ও মূর্ত্তি সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ বিচার এবং গভীর জ্ঞান আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করেছে উনকোটির মূর্ত্তিগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে। মূর্ত্তিগুলির বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে বহুদিন ধরে বহুভাবে তর্ক, আলোচনা ও পরামর্শ করতে হয়েছে। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলির সমর্থনে তাঁর সহায়তা পেয়েছি নানাভাবে। কেবল গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রেই নয়, বহুভাবে তাঁর কাছে সুপরামর্শ পেয়েছি—এমন কি তাঁর সাহায্য না পেলে এই গ্রন্থ এত সহজে প্রকাশিত হত না। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

ছাত্র-ছাত্রীরাও আমাকে সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হয় নি। আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান সত্যব্রত নাথ, ধর্মপরায়ণ প্রাচীন বয়স্ক 'নাথ মহাজন'-দের কাছ থেকে নাথ-ধর্ম সম্পর্কিত মূল্যবান গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে এনে দিয়ে আমায় উপকৃত ও বাধিত করেছে। কল্যাণীয়া শ্রীমতী বীণা দাস এবং শ্রীমতী সাথী দাস এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নকল করে দিয়ে উপকৃত করেছে আমাকে।

তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং আমার শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীষ রইল তাদের জন্য।

ত্রিপুরা সরকারের প্রচার-বিভাগীয় এ্যাসিষ্ট্যান্ট পাবলিসিটি অফিসার শ্রীসুব্রত চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ছাড়াও উনকোটি সংক্রান্ত তথ্য এবং রাজমালা গ্রন্থের বিষয়বস্তু সরবরাহ করে প্রীতিমুগ্ধ করেছেন আমাকে। বস্তুতঃ পক্ষে তাঁর মূল্যবান সহায়তা এই গ্রন্থের পক্ষে অপরিহার্য্য প্রয়োজন ছিল। আগরতলা এ. জি. অফিসের শ্রীপরিমল চৌধুরী মহাশয়ের কাছেও আমি উপকৃত হয়ে আছি। করিমগঞ্জের ফটোগ্রাফার ও শিল্পী শ্রী ডি এল. দেব মহাশয় গভীর উৎসাহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে উনকোটির মূর্ত্তিগুলির ফটো Print করে দিয়েছেন। এমন কি দুর্ব্বল নেগেটিভ থেকেও তাঁর চেষ্টা, কুশলতা আর পরিশ্রমের ফলে উৎকৃষ্ট ছবি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তাঁদের সকলের হিতৈষণার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবার মতো ভাষা নেই।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজে মূর্ত্তি বিশারদ এবং ঐতিহাসিক বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, তথ্যগত মূল্যমান উন্নয়ণে ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। শ্রীবিভাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রন্থপ্রকাশে আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করে স্বয়ং প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের আমার প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাস্তবিক ভাবে উৎসাহ পেয়েছি অনেকের কাছে। আমার কর্ম্মক্ষেত্রে অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীধীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইতিহাসের প্রবীন অধ্যাপক। ইতিহাসে তাঁর জ্ঞান সুগভীর। আমায় নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন তিনি এবং তাঁর সংগৃহীত উনকোটির মূর্ত্তিগুলির পাঁচটি ফটোগ্রাফ এই গ্রন্থে প্রকাশ করার অনুমতি দিয়ে অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন আমাকে। ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বহুভাবে উৎসাহিত করেছেন আমাকে। তাঁদের দুজনের জন্য আমার সকৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

শিক্ষা-জীবনে যিনি আমার আদর্শ, এবং আজকের এই শিক্ষকতা জীবনেও যাঁর সহৃদয় ব্যবহার, স্নেহ এবং শিক্ষায় প্রতিমুহূর্ত্তে কৃতার্থবোধ করি,—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমার মাস্টারমশায় ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র মহাশয়, যিনি শিক্ষা ও উৎসাহ দিয়ে আমার জীবনকে অগ্রসরিত করেছেন,— গ্রন্থারম্ভের প্রথমেই তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আর, অধ্যাপিকা শ্রীমতী ভাস্বতী দেবীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই যিনি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাবস্থায় আমাকে কেবল উৎসাহ দিয়েছেন,— নানাভাবে তাঁরই সহায়তায় এই গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হল।

তবু একথাও সত্য, এই ক্ষুদ্র এবং প্রথম প্রচেষ্টায় আমার সামর্থ্য যেটুকু, তার চেয়ে বেশী উৎসাহই পেয়েছি সকলের কাছে। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য, কোনও নিশ্চিত ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার অহঙ্কার নয়। উনকোটি বিশাল, উনকোটি বিস্ময়কর—এবং উনকোটির পাহাড়ের বুকে অনেক আশ্চর্য্য ইতিহাস আজও চাপা পড়ে আছে। আমি ইতিহাসের অধ্যাপক নই—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেই আমার দুর্ব্বল অধিকার, কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস চিরকাল আমার কল্পনাকে উদ্দীপিত করে, আবার যুক্তি চায় কল্পনা থেকে মীমাংসায় উপনীত হতে। সেই প্রেরণায় আমি সম্ভাব্য-সত্য সন্ধান করেছি এই গ্রন্থে। সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত গবেষক কোন নব-সিদ্ধান্তের দিগন্ত-সন্ধান যদি করেন কোনদিন, তবে দুর্গম উনকোটির গুপ্ত-রহস্যের দ্বারে উপনীত হবার পথ-নির্ম্মাণে প্রথম শ্রমিক হবার উদ্দেশ্যেই আমার এই সামান্য প্রয়াস। আমি কেবল তুলে ধরতে চাই উনকোটিকে সকলের সামনে—সমালোচনার যুক্তিজালে আমার ধারণার সত্য-অসত্য নির্ণয় বড় কথা নয়; কিন্তু এই গ্রন্থ যদি উৎসাহী পাঠক-পাঠিকা ও যোগ্য-গবেষকের কাছে কিছুমাত্র মূল্য প্রদান করে—সেই হবে আমার চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ। এই কথা জানিয়েই আমি বিস্ময়কর উনকোটির সেই অসংখ্য দেবমূর্ত্তিগুলিকে এবং তাঁদের সুপ্রাচীন পূজারী জীর্ণ চীবর পরিহিত ভয়ঙ্কর মানসিকতাসম্পন্ন অঘোরী-কপালী সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে রেখে যাই আমার নীরব প্রণাম।

শিবম্ সত্যম্ সুন্দরম্

আবৃত-ইতিহাস ঃ ঊনকোটি

ঊনকোটিপীঠমধ্যে প্রধানং তানি শঙ্কর।
এবাস্তু দেবতাঃ সর্ব্বা এবাস্তু দশভৈরবাঃ॥
মনোরমোত্তরভাগে উচ্চভূমি প্রদৃশ্যতে।
তত্র কোটীশ্বরং লিঙ্গং একোনং স্বর্গমাপ্নুয়াৎ॥

(বারাহী তন্ত্র)

"সন্ধ্যা নামল !

তাই সাজো-সাজো রব পড়ে গেল স্বর্গরাজ্যে।

না, যুদ্ধ সজ্জায় নয়—প্রমোদ কেলির প্রাক্কালে প্রসাধন-সজ্জার হুলুস্থুল কাণ্ড। দেবতারা চলেছেন মর্ত্ত্যভূমিতে—মর্ত্ত্যমানবের নিমন্ত্রণে। কোনো এক অজ্ঞাত-নামা নৃপতি আশ্বাস দিয়েছেন—যথাবিধি দেব-আরাধনা এবং পূজা-উপকরণের আয়োজন তো প্রস্তুত রয়েছেই—তৎসহ আনুসঙ্গিক লীলা-বিলাসের আয়োজনও অপ্রতুল হবে না। দেবসভায় স্বীকৃতির তরঙ্গ হিল্লোলিত হতে বিলম্ব হল না। হাঁ, দেবতারা প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করলেন, মানব নৃপতির নিমন্ত্রণ। কিন্তু···মর্ত্ত্যভূমিতে চরণন্যস্ত অবস্থায় সবিতা-সন্দর্শন দেবতাদের পক্ষে অশ্রদ্ধেয় পাপাচরণ। তাই দেবগণের সর্ত্ত—অরুণোদয়ের পূর্ব্বে,

কাক-পক্ষী ডেকে ওঠার আগেই, মর্ত্ত্যখণ্ড ত্যাগ করে, তাঁরা ফিরে আসবেন স্বর্গধামে। সর্ত্তে সম্মত হলেন নৃপতি।

দেবতারা এলেন।

ধন্য হলেন মানব-নৃপতি—দেবচরণ স্পর্শে মর্ত্ত্যভূমি পুণ্যময় হল। এই পুণ্যলগ্নকে অমিয়-স্নিগ্ধ করার জন্য সোমদেব আকাশ ভরে দিলেন জ্যোৎস্না-সুধায়।···কিন্তু সর্ব্বনাশ এল সেই পথেই। মূঢ়মতি এক বায়স আকাশে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল জ্যোৎস্না দেখে, ভোর হয়েছে মনে করে, পৃথিবীর প্রভাত-বন্দনা করল আনন্দিত কলকণ্ঠে। বায়স-কণ্ঠে প্রভাত-বন্দনায় নৈশ সুষুপ্তি ছিন্ন হয়ে গেল—জেগে উঠল মর্ত্ত্যমানবেরা। মানবকুলের সঙ্গে একই ভূমিতে দণ্ডায়মান হয়ে প্রভাত-যাপন অপরাধে মুহূর্ত্তে দেবতারা পাষাণে পরিণত হলেন। যে-কাকটি ভুলক্রমে প্রথম ডেকে উঠেছিল, দেবরোষে সেটিও পাষাণ হয়ে গেল তাঁদেরই সঙ্গে।···

তারপর, অতীত হয়ে গেছে কতকাল! কত যুগ ধরে দেবতারা লোকচক্ষুর অন্তরালে, উনকোটি পাহাড়ের বুকে প্রস্তরীভূত হয়ে প্রতীক্ষা করে আছেন, এক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের জন্য—যখন উপস্থিত হবে তাঁদের মহা-মুক্তিলগ্ন।”

এটি কিংবদন্তীর কথা। ধর্ম্মনগর এবং কৈলাসহরবাসী নবীনদের কাছে এটি কাহিনী মাত্রই। কাহিনীর অন্তরালস্থিত গভীরতর কোন অর্থ-সন্ধানের জন্য তাঁরা কৌতূহলী হয়ে উঠেন না। বয়োবৃদ্ধ যে-কোনও প্রাচীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু এটি বিশ্বাসের বস্তু। বিশিষ্ট

সংস্কার বললেও অত্যুক্তি হবে না। যুগান্তরের পথ পরিক্রম করে এই কিংবদন্তী একালে অলৌকিক মহিমা ধারণ করেছে। তবু সন্দেহ নেই, কিংবদন্তীর উৎস নিশ্চয় অলৌকিক নয়। সব কিংবদন্তীর পিছনেই প্রচ্ছন্ন থাকে একটি ঐতিহাসিক সত্য। এই ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার সঙ্গত কারণ কিছু নেই। সূত্র সন্ধান করে যদি হাজার বছর পিছনের পথে হাঁটা যায়, তবেই হয়তো মিলতে পারে সেই সত্যের সন্ধান।

উনকোটির অবস্থান ধর্ম্মনগর এবং কৈলাসহরের প্রায় মধ্যবর্ত্তী স্থানে। ধর্ম্মনগর থেকে বার মাইল এবং কৈলাসহর থেকে সাত মাইল দূরে, এই উনকোটি পাহাড় ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাসের অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত বিস্ময় বুকে বহন করে, ধীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ভৌগোলিক অবস্থান তার ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত। কাছাড় জেলা অথবা অধুনা পাকিস্তানভুক্ত শ্রীহট্ট বা কুমিল্লা জেলা থেকে জ্যামিতিক রেখায় এর দূরত্ব কোন ক্ষেত্রেই ষাট মাইলের অধিক নয়। উপরি উক্ত কিংবদন্তীর সত্য-সন্ধানে উল্লেখিত স্থানগুলির ঐতিহাসিক অথবা ধর্ম্মনৈতিক জীবনের পরিচয় গ্রহণ করলে হয়তো বা একটি সূত্রলাভ সম্ভব হতে পারে।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "শ্রীহট্টের সন্নিকটবর্ত্তী ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার প্রান্তবর্ত্তী এই তীর্থ শ্রীহট্টবাসীর তীর্থ বলিয়াই গণ্য হয়। (শ্রী. ই. পৃঃ ১১৫)।" উনকোটি একটি ছোট পাহাড়। চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি উচ্চতর শৃঙ্গবিশিষ্ট জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বত বর্ত্তমান। উনকোটি শৃঙ্গ তার মধ্যে দুর্গম এবং এক ভয়ঙ্করী রম্যতাকে সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে অবস্থান করছে। পাহাড়টির বিরাট পরিধি জুড়ে

সানুদেশের পর্ব্বতগাত্রে বিপুল সংখ্যক প্রস্তর মূর্ত্তি দেখা যায়। অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে, যাদের পরিচয় উদ্ধার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে সম্ভব নয়। তার জন্য আবশ্যক বিশেষজ্ঞের।

উনকোটিতে যাবার পথ—দুটি। একটি, পুরানো পথ। সেখানে অরণ্য ঘনতর এবং দুর্গম। নূতন আর একটি পথ, ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও পুনঃ নির্ম্মিত একটি সুপ্রাচীন রাজপথ সংলগ্ন হয়ে, বন্ধুর ও সর্পিল গতিতে অগ্রসর হতে-হতে ক্রমে উপনীত হয়েছে উনকোটির প্রথম শৃঙ্গের দুটি বিশাল আয়তন মূর্ত্তির কাছে। পথের শেষও সেইখানে। এই স্থান থেকে বিভিন্ন শৃঙ্গে যেতে হলে পর্ব্বত আরোহণ-অবতরণের শ্রম ও দুঃসাহস বিশেষ ভাবেই প্রয়োজন। অবশ্য পার্ব্বত্য অধিবাসীরা কোন কোন স্থানে পাহাড় কেটে সোপানশ্রেণী কিছু নির্ম্মাণ করেছে, তৎসত্ত্বেও পথ আদৌ সুগম হয় নি।

বিপুল আয়তন মূর্ত্তি দুটিকে শিব ও দুর্গার মূর্ত্তি বলে মনে করা যেতে পারে। আধুনিক কালে ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক পুনঃ নির্ম্মিত যে প্রাচীন রাজপথ ধর্ম্মনগর এবং কৈলাসহরকে যুক্ত করেছে, উনকোটিগামী নূতন এই পথ তারই সঙ্গে সংযুক্ত। উনকোটি তীর্থে যাবার নব-নির্ম্মিত পথটির শেষ প্রান্তে অবস্থিত এই মূর্ত্তি দুটি যেন সমগ্র তীর্থস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে বিরাজ করছে। দেবস্থানে যাবার এই পথটির দুই পাশেও অরণ্যশোভার অভাব নেই। তবে ক্লেশসাধ্য পথে ছোট-ছোট ঝর্ণা, জঙ্গল ও চড়াই-উৎরাই পার হয়ে দুর্গমকে উত্তীর্ণ হওয়ার যে আনন্দ-রোমাঞ্চ পুরাতন পরিত্যক্ত পথটিতে আছে, নূতন পথটিতে অবশ্যই তা নেই।

শিব-দুর্গার এই মূর্ত্তি দুটি কৈলাসহর এবং ধর্ম্মনগর নিবাসী অনেকের ধারণায় একটি বৃহৎ রথরূপেই গৃহীত। বস্তুতঃ তা যে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা, সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বৃহৎ মুণ্ড-দুটির কর্ণচতুষ্টয়ে দুইজোড়া প্রকাণ্ড চক্রাকার কুণ্ডল পরিহিত আছে। কুণ্ডলগুলিই রথচক্ররূপে অনেকের বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। এই দুটি শিব-দুর্গারই মূর্ত্তি সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মূর্ত্তি দুটি বিপুলায়তন—সে কথা আগেই বলা হয়েছে। উভয় মূর্ত্তিই শ্মশ্রুগুম্ফহীন। কণ্ঠ ও মস্তকে রুদ্রাক্ষমালা। পরুষ-ভাবাপন্ন একটি মূর্ত্তিতে বৃহৎ জটাজাল, চক্রাকার কর্ণাভরণ এবং দংষ্ট্রাব্যাদিত বিকট হাস্য বর্ত্তমান থাকায় সেটি পুরুষ মূর্ত্তি, এবং শিবমুণ্ড বলেই মনে হয়। অন্য মুণ্ডটিতে সূক্ষ্ম কারুকর্ম্ম ভ্রূযুগলের বঙ্কিম ধনুরেখায় দুটি তরঙ্গ সৃষ্টিতে—রমণীসুলভ লাবণ্য। নয়নদ্বয় স্নিগ্ধতর দৃষ্টি সম্পন্ন। এটিকে দুর্গামূর্ত্তি রূপেই তাই চিহ্নিত করা যেতে পারে। উল্লেখযোগ্য, মুণ্ড দুটির উচ্চতা ন্যূনপক্ষে ২৫ ফুটের কাছাকাছি। দুটি মূর্ত্তিই জীর্ণ, ভগ্নদশাগ্রস্ত।

এই পাহাড়ের পাথরের ভাঁজে ভাঁজে বিশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত সোপানশ্রেণীর মত পথ অবলম্বন করে, বহু নিম্নে অবতরণ করার পর, অপর একটি শৃঙ্গের সানুদেশে উপনীত হওয়া যায়। এখানে আর একটি শিবমুণ্ড রয়েছে। এটি আয়তনে বৃহত্তর এবং অনুমান হয়, এটির উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুটের মত। এটির কণ্ঠে ও কপালে রুদ্রাক্ষমালা, কর্ণে বৃহৎ কুণ্ডল এবং মুখমণ্ডল ব্যাদিত, বিকট হাস্যে উদ্ভাসিত। ত্রিনেত্র বিশিষ্ট এই মূর্ত্তিটি বিশেষ লক্ষণীয়। এর দুই পার্শ্বে দুটি বৃহৎ নারীমূর্ত্তি পর্ব্বতগাত্রে খোদিত রয়েছে। মূর্ত্তি দুটি সম্পূর্ণ নগ্না। সম্মুখে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী ঝির-ঝির শব্দে প্রবাহিত হয়ে

চলেছে। নির্ঝরিণীর উপরেই একটি বৃহৎ শিলাখণ্ডে নির্ম্মিত সম্পূর্ণাঙ্গ শিবমূর্ত্তি ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান। প্রকৃতির আক্রমণের হাত থেকে এরা কেউ-ই আত্মরক্ষা করতে পারে নি। তাই স্থানে স্থানে পাথর ভেঙে গিয়ে ভয়ঙ্করদর্শন এই শিবমূর্ত্তিকে আরও বীভৎস করে তুলেছে। এই মূর্ত্তিরই পাদপীঠে তিনটি বৃষমূর্ত্তি ইতস্ততঃ ছড়ান। সেগুলি আয়তনে কমপক্ষে ৬ ফুট দীর্ঘ।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, সমগ্র অঞ্চলটি জঙ্গলাকীর্ণ ছায়াময়, ঝর্ণাবেষ্টিত এবং বিচিত্র রহস্যাচ্ছন্ন। একটি ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা সমগ্র অঞ্চলটিকে থমথমে করে রেখেছে। সেই অপার্থিব রহস্য বিস্ময়-মিশ্রিত ত্রাসের সঞ্চার করে। তারই মধ্যে ত্রিশূলধৃত শিব এবং মহামুণ্ড শিব নিঃশব্দে দন্তপংক্তি ব্যাদিত করে বিশ্ব প্রকৃতিব দিকে চেয়ে আছেন।

এত অধিক সংখ্যক মূর্ত্তির সমাবেশ এখানে যে, কোন্ দেবতাকে আশ্রয় করে এই ধর্ম্মস্থান গড়ে উঠেছে তা বলা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু শিবমূর্ত্তির প্রাধান্য হেতু একে শৈবস্থান বলেই আপাতভাবে মনে হয়। বিভিন্ন উচ্চতায়, ভিন্ন ভিন্ন শৃঙ্গে অসংখ্য প্রকারের মূর্ত্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হরপার্ব্বতী, বিষ্ণুমূর্ত্তি, নৃসিংহাবতার, ত্রিনাথ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, হনূমান, ধনুর্ব্বানধারী পুরুষ মূর্ত্তি, গঙ্গাবতরণ, যৌনমুদ্রাজ্ঞাপক নারী মূর্ত্তি, আসনের উপরে দণ্ডায়মান অর্দ্ধ-নগ্না নারী, গণেশ মূর্ত্তি এবং বৃহৎ প্রস্তর-খোদিত বৃষমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান। মনে হয়, শৈবস্থানে পবিবার-দেবতারূপে দুর্গা, গঙ্গা, গণেশ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু, হনূমান ও নন্দীবৃষ থাকা অযৌক্তিক বা অসঙ্গত নয়।

'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়

বলেছেন, "পার্ব্বত্য ত্রিপুরা উনকোটি······পালপর্ব্বের এই শৈব-তীর্থে······একাধিক বৃহদাকৃতি শৈবপ্রতিমার শির উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।" অনুমান করা যেতে পারে, পাল রাজত্বের শেষ পর্ব্বে এই শৈবতীর্থ স্থাপিত হয়েছে। খোদিত অনেকগুলি মূর্ত্তিতে দশম -একাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য্য নিদর্শন বর্ত্তমান। কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর এবং এতদঞ্চলের প্রাচীন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রচলিত বিশ্বাস—এই ধর্ম্মস্থান কোন এক বিশেষ সময়ে, হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মস্থানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্পর্কে পূর্ব্বকথিত কিংবদন্তীর পাশাপাশি অপর একটি কিংবদন্তীর প্রচার আছে :

"অধার্ম্মিক ব্রাত্য-জাতির মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা প্রতিষ্ঠার মানসে, প্রাচীন কালে কোন এক নৃপতি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন ধার্ম্মিক এবং পুণ্যবান। এমন কি দেবতারাও তাঁকে সম্ভ্রম করে চলতেন। ব্যাসদেব যেমন ব্যাস-কাশী প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছিলেন,—বলদর্পী এই নৃপতিও সেই মতো, কোটিতীর্থ কাশীর ন্যায় এক দেবস্থান প্রতিষ্ঠার বাসনা করেন। রাজা স্থির করলেন এক কোটি দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করবেন। কিন্তু স্বর্গে তেত্রিশ কোটি দেবতা অপ্রসন্ন হলেন মর্ত্ত্যমানবের ঐইরূপ অহঙ্কারে। নৃপতির এই অহঙ্কারের বিরুদ্ধে দেবতারা তৎপর হলেন তাঁকে বিফল করবার জন্য।······চিন্তিত হলেন নৃপতি। তবে কি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তাঁর সংকল্প? নানা প্রকারে অবশেষে দেবতাদের প্রসন্ন করে তিনি চাতুর্য্যপূর্ণ এক দেবাদেশ পেলেন—'যদি একটি রাত্রির মধ্যে রাজা এই কার্য্য সম্পন্ন করতে সমর্থ হন, তবেই এই স্থান হবে ভারতখণ্ডের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। যেখানে মৃত্যুমাত্র অক্ষয়পুণ্যবলে অক্ষয়-স্বর্গলাভের অধিকার হবে ভক্তের।' এই সুকঠিন কার্যে ব্রতী হবে—কে আছে

এমন শক্তিমান ? চিন্তায় আকুল নৃপতি দিকে দিকে পাঠিয়ে দিলেন অনুচরদের। বহু অনুসন্ধানের পর অবশেষে পাওয়া গেল সেই ভাস্করকে।

তিনি এলেন। মহাসমারোহে, বিপুল আয়োজনে প্রস্তুত হলেন তিনি। তাঁর সর্ত্ত—'প্রদোষলগ্নে তিনি প্রবৃত্ত হবেন আপন কর্ম্মে। কিন্তু,…ঊষাকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন দ্বিতীয় প্রাণীর উপস্থিতিমাত্র যন্ত্রাদি পরিত্যাগ করে চলে যাবেন।'

তথাস্তু! সম্মত হলেন রাজা। কিন্তু দেবতারা উপায় সন্ধান করতে লাগলেন এই কার্য্য পণ্ড করবার জন্য।

ভাস্কর নিবিষ্টমনে, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। রাত্রির শেষ যাম সমাসন্ন। কোটি দেবমূর্ত্তির নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত-প্রায়। আর একটি মাত্র মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করলেই সম্পূর্ণ হয় তাঁর সুকঠিন ব্রত। পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত ভাস্কর কপালের ঘর্ম্ম মোচন করলেন বাম হস্তের অঙ্গুলি চালনা করে। যন্ত্র হাতে শেষ মূর্ত্তিটি নির্ম্মাণ করবার জন্য শিলাখণ্ডে যন্ত্রাঘাত মাত্র করেছেন—এমন সময় দেবতাদের চক্রান্তে প্রেরিত একটি কৃষ্ণবায়স কলকণ্ঠে ডেকে উঠল। আসন্ন প্রভাতের ঘোষণা জানাল। প্রভাত হয়েছে মনে করে এবং দ্বিতীয় প্রাণীর আবির্ভাব-অপরাধে, যন্ত্র পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন ক্ষুব্ধ ভাস্কর। তারপরেই দৈবচক্রান্ত উপলব্ধি করলেন, আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে। ক্রোধে কম্পমান হয়ে বায়সকে অভিসম্পাত করে চলে গেলেন ভাস্কর। শাপগ্রস্ত বায়স নিমেষে পাষাণে পরিণত হল। 'উনকোটি মূর্ত্তি বেষ্টিত' অক্ষয়পুণ্যহীন এই দেবস্থান সেই থেকে উনকোটি তীর্থ নামে পরিচিত হল।"

এই কিংবদন্তী নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। কেন না, অনুরূপ কথা বিভিন্ন দেবস্থানেই প্রচলিত আছে। এটি তাই উপকথারূপে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপ্তিলাভ করেছে—এইরূপ অনুমান হয়। স্থান কাল এবং যুক্তিগত ভাবে প্রথমোক্ত কিংবদন্তীর প্রতিই আস্থা রাখা সম্ভব। কিন্তু সে কথা এখন নয়,•••আরো পরে।

এই পর্ব্বতেরই ভিন্ন একটি শৃঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী অংশ দিয়ে, অতি দুর্গম পথে অবতরণ করে, চতুষ্পার্শে পর্ব্বতশৃঙ্গবেষ্টিত প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত পরিধি পরিমাণ জঙ্গলাকীর্ণ একটি বিশিষ্ট অংশকে, অতি বিচিত্র স্থান হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। রাঁচি জেলার জোন্‌হা জলপ্রপাতের যেরূপ স্তরে স্তরে নিম্নাবতরণের প্রকৃতি আছে, তেমনি এখানেও অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী বা ছড়া (স্থানীয় নাম) কয়েকটি স্তরে ক্ষুদ্র প্রপাতের মত নেমে এসেছে। স্থানটি অত্যন্ত রমণীয়, অথচ সমগ্র পরিমণ্ডলে কেউ বলে না দিলেও অনুভব করা সম্ভব—কেমন যেন একটি তান্ত্রিক ভয়াবহতা সংগুপ্ত। রাজগৃহ (রাজগীর) অঞ্চলে মহাযানী বৌদ্ধদের তন্ত্রপীঠের মতো রহস্যময়, শীতল স্তব্ধতা এখানে যেন থম্‌কে থেমে আছে। দেবী কামাখ্যা মন্দিরের যোনিপীঠের গর্ভগৃহের রহস্যময়তার চেয়েও যেন সুগম্ভীর। সেখানে পর্ব্বতগাত্রে এক বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য—২০ ফুটেরও বেশী উচ্চ পর পর তিনটি গণেশ মূর্ত্তি পাশাপাশি অবস্থিত। একটি তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। পদ্মাসন মূর্ত্তিটির ঊর্দ্ধাঙ্গ বিধ্বস্ত। নিম্নভাগে গণেশের সুবিপুল উদরসহ সমগ্র প্রস্তরভাগ এখনও অটুট—তবে প্রকৃতির আক্রমণ থেকে অধিক দিন আর আত্মরক্ষায় সক্ষম হবে কিনা, বলা কঠিন। ত্রি-গণেশের

একেবারে দক্ষিণ পার্শ্বে একটি মূর্ত্তি, স্ত্রী অথবা পুরুষ—সঠিক নির্ণয় করা যায় না। এই মূর্ত্তিগুলি পৌষ-সংক্রান্তি এবং চৈত্রমাসের অষ্টমী তিথিতে, পার্ব্বত্য রিয়াং জাতির দ্বারা পূজিত হয়। পূজা-পদ্ধতিও তান্ত্রিক মতে।

পার্ব্বত্য উপজাতির পুরোহিতের কাছে বসে পূজা ও অঞ্জলি প্রদান করা হয় দেবতার উদ্দেশ্যে। ফুল ও চাল অঞ্জলির প্রধান উপাদান। সর্ব্বশেষে ছাগ বলিদান ক্রিয়া পূজার প্রধান অঙ্গরূপে স্বীকৃত। এতগুলি মূর্ত্তিযুক্ত একটি স্থান, লোকের অজ্ঞাত না হলেও, লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে। হিন্দু তীর্থযাত্রী এবং পুণ্যার্থীরা অনেকে এই স্থানের নাম জানেন; দেব দর্শনোদ্দেশে আগমন করেও থাকেন। কিন্তু হিন্দুতীর্থের বৈশিষ্ট্য এখানে নেই। তাই ভীড় নেই পুণ্যার্থীর। এমন কি পার্ব্বত্য উপজাতিগুলিও এর আশেপাশে বসতি স্থাপন করে নি। সমগ্র বৎসরে দু'বার জনসমাগম ছাড়া, প্রস্তরীভূত দেবতাগণ নির্জনে অসহায় ভাবে প্রকৃতির অনুরাগ-বিরাগের আতিশয্য সহ্য করেন।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও আসাম-শ্রীহট্ট অঞ্চলে বহু পার্ব্বত্য উপজাতির বাস। তারা রক্ত-সম্বন্ধে পবস্পরের নিকটবর্ত্তী হয়েও চিন্তা ও আচারে ভিন্ন। তাদেরই মধ্যে একটি বিশিষ্ট জাতির সঙ্গে উনকোটির সম্বন্ধ নিবিড়। নাতিদীর্ঘ এই মানুষগুলির গায়ের রঙ ফিকে হলুদ। ঘরে-বোনা এক ফালি কাপড় মাথায় পাগড়ির ধরনে বাঁধা, কানে অর্দ্ধ-চক্রাকার কর্ণাভরণ, খাটো ধুতি পরিধানে। শক্ত পেশীবহুল শরীর এবং নাক মুখ ও চোখের গঠনে 'মঙ্গোলয়েড' ছাপ সুস্পষ্ট। এদের স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েই

সুশ্রী। মেয়েরা ‘চাক্‌মা’ জাতির মেয়েদের মতো নিজেদের হাতে-বোনা রঙীন কাপড়ের টুকরো পরে। রুপালী চক্রশোভিত ‘নরী হার’ (লহর হার) পরার জন্য তারা পাগল। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম আর কাছাড় জেলার সীমান্তগুলিতে এরা ছড়িয়ে আছে। ‘কুকি’ সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত এই জাতি পার্ব্বত্য ত্রিপুরার পার্ব্বত্য উপজাতিগুলির মধ্যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ। এদেরই নাম ‘রিয়াং’ জাতি।

পৌষ-সংক্রান্তি আর অশোক অষ্টমীর তিথিতে[১] এরা দলে দলে এসে পৌঁছয় যে পাহাড়ে—তারই নাম উনকোটি। সমগ্র বৎসরে মাত্র তুইবার এই পাহাড়ের পাথরের দেবমূর্ত্তিগুলি মানুষের সঙ্গ পান। তাদের পূজা গ্রহণ করেন; তৃপ্ত, শান্ত, নির্ব্বিরোধী এই নরনারীর আনন্দ-সঙ্গীতে দেবতারাও বোধ হয় সুখী হয়ে ওঠেন। তারপর, দিন শেষ হয়ে আসে!

রিয়াং নরনারী ফিরে যায় তাদের গ্রামগৃহে। উনকোটিতে কোন মন্দির নেই[২] তাই পুরোহিতও চলে যায়, জনশূন্যতায়

---

[১] রাজমালা—[ত্রিপুর রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্তান্ত] পৃষ্ঠা-১০৭-১১৫
রাজমালায় লিপিবদ্ধ হয়েছে,—“প্রতি বৎসর ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে এবং অশোকাষ্টমীতে এই তীর্থে মহামেলা হইয়া থাকে।” লেখক পৌষমাসের সংক্রান্তি তিথিতে স্বয়ং এই মেলায় পার্ব্বত্য জাতিদের সমবেত হতে দেখেছেন। সম্ভবতঃ ফাল্গুনী-মেলা কোন ভাবে পৌষ-মেলায় রূপান্তরিত হয়ে থাকবে।

[২] রাজমালা এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ১ম ভাগ, নবম অধ্যায়-এ মন্দিরের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে।

রাজমালা – পৃষ্ঠা ২০৭-১১৫ : “শৃঙ্গাগ্রে প্রস্তর ও ইষ্টকরাশি প্রকীর্ণাবস্থায়

ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা নেমে আসে উনকোটির বুকে। তখন, শুধুমাত্র অরণ্যচারী পশুপাখীদের বাসভূমি হয়ে ওঠে সেই স্থান--ঘনতর হয় জঙ্গল। কেবল প্রকৃতির এই বন্যশোভা বেষ্টিত দেবস্থানে বন্যপক্ষীরা ভীড় ক'রে দেবতার বন্দনা-গান করে কল-কাকলীতে।

ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। কোন কালে ঐ স্থানে যে প্রস্তর ও ইষ্টক নির্মিত মন্দির ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়।"

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত: "যখন স্বর্গীয় রাধাকিশোর মাণিক্য উনকোটি গিয়াছিলেন, তখন তিনি অল্পদিন পূর্বে নষ্ট একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন।"

"হে অতীত! কথা কও!"

প্রাচীন ইতিহাস অনুসরণ করলে দু-একটি গ্রন্থে এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যাবে। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এই স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। দেবস্থান রূপে এর মহিমাও সেখানে স্বীকৃত। এই ক্ষেত্র মূলতঃ ত্রিপুরার অন্তর্গত ছিল কিনা, এই বিষয়ে আজ সন্দেহ জাগে। উনকোটি পর্ব্বতশ্রেণী স্তরে স্তরে কাছাড়ের পশ্চিম-দিগন্ত-বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ত্রিপুরা অভিমুখে নয়। প্রাচীন দেশসীমা-রীতি অনুযায়ী নদ-নদী, গিরিশ্রেণী ও অরণ্যসীমা নির্ভর এই অঞ্চল শ্রীহট্ট-কাছাড়ের অন্তর্গত হওয়াই বোধহয় সম্ভব। আধুনিক কাল থেকে এক বা দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে তা যে ছিল না—একথা জোর করে আজ বলা সম্ভব নয়। বরং একচ্ছত্র রাজা, রাজধর্ম্ম ও দেশধর্ম্মে যখন স্বধর্ম্ম রক্ষিত, সেই কালে সমগ্র শ্রীহট্টের ধর্ম্ম প্রবণতা উল্লেখিত ভূ-ভাগকে এক ধর্ম্ম-প্রেরণাতেই আবদ্ধ করেছে। উনকোটি তাই ঠিক কোন্ রাজত্ব-সীমায় অবস্থিত ছিল তা না জানলেও আলোচনাসূত্রে লক্ষ্য করা যাবে, অন্ততঃ একই ধর্ম্মনৈতিক সূত্রে সমগ্র অঞ্চলটি গ্রথিত ছিল।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার' বলেছেন—"...উনকোটি তীর্থ শ্রীহট্ট সীমার সন্নিকটবর্ত্তী ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার প্রান্তবর্ত্তী। এই তীর্থ শ্রীহট্টবাসীর তীর্থ বলিয়াই গণ্য হয়।" তিনি আরও বলেছেন, "উনকোটি তীর্থে কোনরূপ পূজার প্রথা নাই।"

যেখানে পূজার প্রথা নেই, হিন্দু পুণ্যার্থী সেখানে দৈব মহিমায় সামান্যই আকৃষ্ট হন। বস্তুতঃ হিন্দু দেবস্থান বা তীর্থস্থানের কোন বৈশিষ্ট্যই এখানে নেই। কোনও মন্দিরও এখানে নেই। যদিও 'উনকোটি মাহাত্ম্য' নামে প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে জানা যায়—"......এই তীর্থস্থানে একটি মন্দির ছিল। তাহার লুপ্ত-প্রায় চিহ্ন এবং ইষ্টক ও প্রস্তরাদি সরঞ্জাম এখনও পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মন্দির কাহার নির্ম্মিত ছিল, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই।"[৩]

পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলেছেন—"শৃঙ্গগাত্রে প্রস্তর ও ইষ্টক রাশি প্রকীর্ণাবস্থায় ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। কোন কালে এই স্থানে যে প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির ছিল তাহা বেশ্ অনুমিত হয়। একটি মন্দির যে অতি অল্প দিন পূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।"[৪]

[৩] এবং [৪] রাজমালার পৃষ্ঠা ১০৭-১১৫ : "সংস্কৃত রাজমালায় লিখিত আছে—ঘিমাবয্য সুতো জাতঃ কুমারঃ পৃথিবী পতিঃ স-রাজা ভুবনখ্যাতঃ শিব ভক্তি পরায়ণঃ॥ কেরাত রাজ্যে স নৃপশ্চাস্থল নগরান্তরে শিবলিঙ্গং সমদ্রাক্ষীৎ হুবড়াই কৃতে মঠে॥"

"রাজমালায় লিখিত আছে— . এই স্থান সনু নদীর তীরবর্তী কিরাত প্রদেশে অবস্থিত। কথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজা হুবড়াইতথায় মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। হুবড়াই, মহারাজ ত্রিলোচনের নামান্তর।"

তুঃখের বিষয় এখন কোন ভাবেই এর পরিচয় লাভের উপায় আর নেই। সমগ্র পর্ব্বতসীমায় ইষ্টক ও প্রস্তরাদির চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই যার সাহায্যে এই উক্তিগুলি নির্ভরযোগ্য মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে অনেকগুলি মূর্ত্তি, বিশেষতঃ গণেশ, হরপার্ব্বতী, বিষ্ণু, হনূমান প্রভৃতির নির্ম্মাণ কার্য্য লক্ষ্য করলে স্বতঃই সন্দেহ হয় সেগুলি কোন মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন ছিল। অবশ্য এগুলি পরীক্ষার পর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। বর্ত্তমানে উনকোটিতে কোন মন্দির নেই, কোন দেউলের উদ্ধত চূড়া পর্ব্বতশৃঙ্গকে লজ্জা দিয়ে আকাশ স্পর্শ করে না। সৌন্দর্য্য-হীন, বৈশিষ্ট্যহীন পর্ব্বতগাত্রে খোদিত কতকগুলি মুণ্ডাকৃতি দেবতা, যাঁরা হিন্দুভক্তের কাছে পূজাটুকুও আদায় করে নিতে পারেন নি—হিন্দুভক্ত সেই তীর্থকে মনে মনে স্বীকার করলেও, উনকোটি পাহাড়ের জঙ্গল ও তুর্গম চড়াই-উৎরাই পার হয়ে, পূজা নিবেদনে প্রেরণা বোধ করে নি। তাই বলে দেবতারা সম্পূর্ণ অবহেলিত নন। তাঁরা আর্য্য-হিন্দু ও সভ্য মানবের পূজার আকাঙ্ক্ষা না কবে নীরবে প্রতীক্ষা করেন বৎসরেব তুটি তিথির জন্য, যখন রিয়াং জাতি এবং চাক্‌মা, ফাদোং নাইতোং দাঁইদাক্, তোম্বাই প্রভৃতি ত্রিপুরার পার্ব্বত্য হিন্দুজাতির নরনারী পরম আগ্রহে এখানে উপনীত হয়। তারা 'মানসিক' করে, মস্তক মুণ্ডনের পর শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সমাধা করে; তান্ত্রিক-মতে বিচিত্র মন্ত্রোচ্চারণে (সংস্কৃত মন্ত্র নয়), ছাগ বলিদানে ও তণ্ডুল নারিকেল পত্র-পুষ্পেব অঞ্জলি প্রদানে দেবতাকে প্রসন্ন করে, নিজেরাও শান্তি পায়। তাই সেখানে হিন্দুর জন্য নেই কোন পূজাবিধি, কিন্তু এই পার্ব্বত্য অর্দ্ধ-সভ্য জাতির জন্য পূজাবিধি রয়েছে। আছে ভক্তি-অর্ঘ রচনার নিষ্ঠা।

তাহলে, উনকোটির যথার্থ পরিচয় কি ? কাশীতীর্থ, গয়াতীর্থ, জগন্নাথতীর্থের মতো, আর্য ধর্মস্থান হিসাবে এর কোন মূল্যায়ণ কি সম্ভব নয় ? এর অস্তিত্বই বা কত প্রাচীন ?

✓ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে উনকোটি শৈবক্ষেত্র রূপে উল্লেখিত। বিবিধ দেবমূর্ত্তির অবস্থিতি সম্পর্কেও সেখানে আলোকপাত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, উনকোটিতে শিবমূর্ত্তির সংখ্যাধিক্য উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণেই উৎসাহিত করে। কিন্তু, এই বিশেষ ধর্ম্মক্ষেত্রটি যথার্থই কোন্ সম্ভাব্য যুগে স্থাপিত হয়েছিল, তা আজও অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। কারণ এই সম্পর্কে কোন উৎসাহী গবেষকের দৃষ্টি অদ্যাবধি আকৃষ্ট হয় নি।

উনকোটি পাহাড় এবং সেখানে অবস্থিত মূর্ত্তিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করলে একটি বিশেষ ধারণাই জাগ্রত হবে—উনকোটির মূর্ত্তিগুলি কোন এক বিশেষ যুগের এককালীন সৃষ্টি নয়। কতকগুলি মূর্ত্তি সেখানে আছে—বিশেষতঃ কাঠখোদাইয়ের রীতিতে পর্ব্বতগাত্রে যেগুলি উৎকীর্ণ, সেগুলির সুপ্রাচীনত্ব অনস্বীকার্য্য। সেগুলিতে দেখা যায় ভাস্কর্য্য-নৈপুণ্যের অভাব। অমসৃণ শিল্পকর্ম্ম এবং অবয়ব-আয়তনে পরিমিতিবোধের অভাবও লক্ষ্য করবার মতো। আবার, এমন কতকগুলি মূর্ত্তি রয়েছে, যেগুলি পরবর্তী যুগের উন্নত শিল্পকলা ও নৈপুণ্যের পরিচয়বাহী। গণেশ, বিষ্ণু ও ত্রিনাথ-শিব মূর্ত্তিগুলি নিঃসন্দেহে পরবর্ত্তী কালের সৃষ্টি। সেগুলির গঠনকার্য্য, মসৃণতা, এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ অবয়ব নির্ম্মাণ কৌশলে পরবর্ত্তী যুগের শিল্পোন্নতি ও নৈপুণ্যের পরিচয় রয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো একটি বিষয়—শিব ও পার্ব্বতী (দুর্গা) ছাড়াও অপর কয়েকটি দেবমুণ্ডে মঙ্গোলীয়

অথবা বৌদ্ধ আকৃতির চিহ্ন স্পষ্টতঃ বর্ত্তমান। নাসামূল, অধর-ওষ্ঠ এবং দন্তপংক্তিতে সেই চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মাণে কোনও উচ্চশ্রেণীর ভাস্কর্য্য রীতি গৃহীত হয় নি। কাঠখোদাই রীতিতে যেন অপটু হাতের শিল্পকলার সৃষ্টি-প্রচেষ্টা বলেই মনে হয়। এইগুলি কোন বিশেষ যুগের বিশিষ্ট শিল্পরীতি হওয়া অসম্ভব নয়—তবে শূলপাণি শিবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রচেষ্টায় নৈপুন্যের অভাব বিশেষভাবেই বোঝা যায়, কেননা শিবের মুখ ও হাতের ত্রিশূল ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ কোন আকৃতিই লাভ করে নি। মনে হয়, মূর্ত্তি নির্ম্মাণ-কৌশল (Sculpture) তখনও এতদঞ্চলে দক্ষতা লাভ করে নি। যাই হোক, মূর্ত্তিগুলি এক কথায় ত্রাস সঞ্চারক, একথা বলা অযথার্থ হবে না।

অনেক মূর্ত্তিতে আবার হিন্দু ভাস্কর্য্যের চিহ্নও অস্পষ্ট নয়। বিষ্ণু, ত্রিনাথ, গণেশ মূর্ত্তিকে তার নিদর্শন বলে মনে করা যেতে পারে। সেই কারণে আপাতঃভাবে মনে হতে পারে (অনেকেই অবশ্য এমন ধারণা পোষণ করেন) যে, উনকোটি মূলতঃ হিন্দু শৈব ক্ষেত্র ছিল। কোন এক সময়ে বিধর্ম্মীব হস্তগত হওয়ায় এখানে বৌদ্ধ প্রভাবিত মূর্ত্তির সমাবেশ ঘটেছে। পরবর্ত্তীকালে পরাক্রমশালী কোন হিন্দু নরপতি বিধর্ম্মীগণকে পুনরায় বিতাড়িত করে হর-পার্ব্বতী, গণেশ, বিষ্ণু ও ত্রয়ী-দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। ফলতঃ Revival of Hinduism বা হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জাগরণ ও প্রতিষ্ঠার প্রেরণাতে এতদঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে।...কিন্তু এই ধারণাকে নির্ব্বিচারে স্বীকার করা কঠিন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণে লক্ষ্য করা যায়—দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে সেন-বংশীয় রাজন্যবর্গ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মশাসিত

সমাজের অত্যাচারে নিপীড়িত মহাযানী-বৌদ্ধগণ ক্রমেই উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গাঞ্চলে (ত্রিপুরা-আসাম-কামরূপ-ভোট্টদেশে) পলায়ন করে অবণ্য ও পর্ব্বতে আত্মগোপন করেন। সেই হিসাবে, এটি তাঁদেরই আবাসিকস্থল মনে করা অনেকের পক্ষেই হয়তো সঙ্গত বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু শৈব মূর্ত্তির বিপুল-প্রধান্য যেখানে—সেই ক্ষেত্রকে বৌদ্ধক্ষেত্র রূপে ধারণা করা নিশ্চিত ভাবে ভ্রান্ত ধারণা হবে। বিশেষতঃ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের বিশিষ্ট অভিমত—'উনকোটি শৈব ক্ষেত্র।'

এই প্রবন্ধে আলোচনা সূত্রে এটিকে নিছক শৈবক্ষেত্র মাত্রই মনে করা হয় নি, অথচ ডক্টর রায় মহাশয়েব উক্তির সাহায্যে একটি নূতন দিগন্তেব সন্ধানে এখানে ব্রতী হওয়া সম্ভব হয়েছে। উনকোটিকে নির্ভেজাল বৌদ্ধক্ষেত্র বলেও গ্রহণ করা শক্ত। কেননা, বৌদ্ধগণেব আবাসিক-মঠেব প্রধান লক্ষণ কোনও আবাসিক গুম্ফাগৃহ এখানে নেই। এই প্রসঙ্গে আবও একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন—মহাযান-বৌদ্ধদেব বজ্রযান এবং সহজযান শাখান্তর্গত, বজ্রযানগণ দেব-দেবীর বিগ্রহ :পূজাব প্রবর্ত্তন করেছিলেন, সে কথা সত্য। কিন্তু হিন্দু দেব-দেবীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করাই উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তা ছাড়া, তাঁদেব মঠ এবং সঙ্ঘারামগুলি প্রধানতঃ নেপাল-তিব্বত ও ভূটানের পাশপাশেই ইতস্ততঃ ছড়ানো।

-সহজযান বৌদ্ধগণও বজ্রযানদের মতোই হিন্দু ধর্ম্ম অথবা হিন্দু দেবদেবীগণকে অবজ্ঞা অথবা লাঞ্ছনা করার প্রবণতাশীল ছিলেন। ততুপরি এই সম্প্রদায় মূর্ত্তিপূজাতেই বিশ্বাসী ছিলেন না। 'কিং তো মন্তে কিং তো তন্তে, কিং তো ঝান বখানে'—এই ছিল তাঁদেব

বিশ্বাস। অর্থাৎ মন্ত্র, তন্ত্র বা ধ্যান-ধারণার ব্যাখ্যায় জীবনে মুক্তি লভ্য হয না। দেহ-সাধনাতেই মুক্তি। সুতরাং এগুলি বৌদ্ধ অধিকৃত দেবাসন হওযা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। ববং তাঁদেব হাতে হিন্দুব পূজ্য শিব ও গণেশ প্রভৃতি মূর্ত্তিগুলিব ধ্বংস সাধন অনেক বেশী সঙ্গত হওযা উচিত। অন্ততঃ তাঁদেব প্রবণতাব প্রতি লক্ষ্য কবলে এই কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে হয। অথচ কোন কোন দেবমূর্ত্তিতে বৌদ্ধ প্রভাবও অস্বীকাব কবা যায না—এ কথাও সত্য। উনকোটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণেব পথ এই কাবণেই জটিল হযে পড়েছে।

"তাহলে, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মেব মিশ্রণজনিত কোনও ধর্ম্মমতেব দেবস্থান রূপেই কি উনকোটি নির্ম্মিত হযেছিল?"—এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদিত হয।... কিন্তু, সেকথা এখন থাক্...আবো পবে। এই প্রশ্নেব বিশ্লেষণ হওযা নিতান্তই আবশ্যক, সে কথা সত্য, কিন্তু সে প্রসঙ্গ আবো পবেব আলোচ্য বিষয। তবে, একটি কথা পূর্ব্বাহ্নে নিঃসংশযে বলা যায—কতকগুলি মূর্ত্তি, বিশেষতঃ বিশালকায শিবমূর্ত্তি, শিবমুণ্ড, শিব ও দুর্গাব মুকুট, রুদ্রাক্ষ, কুণ্ডল পবিহিত মুণ্ড এবং বিপুলাযতন গণেশমূর্ত্তি ন্যূনপক্ষে দশম-একাদশ শতাব্দীব ভাস্কর্য্য বলেই অনুমান হয়। এইগুলি যে ধর্ম্ম মতাবলম্বীদেব সৃষ্টি হোক না কেন—এবং পববর্ত্তীকালে এই ক্ষেত্র বৌদ্ধ-প্রভাবিত হলেও—সৃষ্টিযুগে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মতেব প্রভাবেই এগুলি নির্ম্মিত হযেছে নির্দ্দিষ্ট কোন একটি ধর্ম্মমতেব ধাবণাকে প্রকাশ কবাব জন্য। আলোচনাক্রমে বিষয়টি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। স্মবণ বাখা ভাল যে সেই প্রাচীন যুগে কোনও একটি বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র ধর্ম্মসম্প্রদাযের পক্ষে এই বিপুল

(Massive and extensive) ভাস্কর্য্য কর্ম্ম সম্ভব নয়, সে বিষযে কোন সন্দেহই নেই। এই সূত্র ধবেই আলোচনাক্রমে আমাদেব বক্তব্য প্রমাণিত হবে—অপনোদন হবে সকল সংশয ও সন্দেহ।

উনকোটিতে শৈবধর্ম্ম ও তন্ত্রাচার

উনকোটির দেবস্থানে শৈবধর্ম্ম-প্রাধান্য লক্ষ্য করবার মতো। কিন্তু সে কেমন শৈবধর্ম্ম ? সমগ্র ভারতভূমিতে শৈবসাধনার বিবিধ রূপ ও পদ্ধতির সঙ্গে বিভিন্ন রূপকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় রুদ্র-কল্পনা বা পশুপতিনাথ-কল্পনার সঙ্গে বাংলাদেশের তন্ত্র ও যোগসাধনার শিবকল্পনায় সুগভীর পার্থক্য রয়েছে। শৈবধর্ম্ম একটি ভিন্ন ধারায় তন্ত্রপরায়ণতার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রসৃত হয়। শৈবধর্ম্মের নির্ভুল উৎস নির্ণয় আজ দুঃসাধ্য। কেননা, বৈদিকগ্রন্থে শিব উল্লেখহীন। অথচ বাংলাদেশে শৈবধর্ম্ম ও তন্ত্রসাধনা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে দৃঢ়মূল হয়েছে। গুপ্তোত্তর যুগে, পালরাজগণের রাজত্বকালীন ব্রাত্য বাঙালীগণের মধ্যে, শিবসাধনাকে কেন্দ্র করে, গূঢ় তন্ত্রসাধনা দেশব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করে। বহু গুপ্ত সাধনপীঠও নির্ম্মিত হতে থাকে।

অনেকের মতে, তন্ত্রসাধনা আদৌ ভারতীয় চিন্তা নয়। হিমালয়ের অপব প্রান্তস্থিত চীন-দেশ থেকে নীত হয়ে বৈদিকযুগ এবং ঔপনিষদিক যুগের সময় থেকেই, তন্ত্রমতে যোগ-সাধনার ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। কোন একটি প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখিত আছে, বশিষ্ঠদেবকে সৌরমুখী পূর্ব্ব দিগ্বর্ত্তী বহির্ভারতীয় দেশ থেকে যোগ শিক্ষা করে আসার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি সত্য হোক, অথবা অযথার্থ যাই হোক না কেন, হিমালয়ের গুহা-গহ্বরগুলিতে তন্ত্রসাধনা সুদীর্ঘকালব্যাপী বিস্তার ও পুষ্টিসাধন

করে চলেছিল—তাতে দ্বিমত নেই। পাল-রাজত্বকালে শৈবধর্ম্ম রাজানুকূল্যলাভে যখন সক্ষম হল, তারই ফলস্বরূপে ক্রমে বহির্বঙ্গ ও মিথিলা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও দক্ষিণভারতে দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। তবে বিস্ময়েব কথা এই যে, যোগ ও তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ বঙ্গদেশেই বচিত হয়েছিল। সুতরাং বঙ্গদেশে শৈবতন্ত্র প্রাধান্যেব কথা অস্বীকাব কবাব উপায় নেই।

গৌড়-বঙ্গে শৈব প্রাধান্যের যুগে বৌদ্ধগণেব অবস্থা ঠিক কিরূপ ছিল—প্রসঙ্গত জানা প্রয়োজন। তথাগত বুদ্ধেব মহাপ্রযাণেব অব্যবহিত পবেই মত-পার্থক্য হেতু, বৌদ্ধগণ মহাযান ও হীনযান এই দুই স্পষ্ট শাখায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে থাকে। শতাব্দীর ব্যবধানে কালক্রমে নানা মতেব অঙ্কুব ক্রমে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে প্রয়াসী হয়ে উঠল। মতদ্বৈধজনিত দল-বিভক্তিব ফলে মহাযান-বৌদ্ধগণ সর্ব্বসাকুল্যে, মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান মতধারায় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল। এই সময় হিন্দু-বাজশক্তিব সহায়তা লাভে প্রবল-হয়ে-ওঠা হিন্দু-ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতবর্গেব কঠিন শাসনে, বৌদ্ধগণ উত্তব-ভারত অঞ্চল থেকে ক্রমেই বিতাড়িত হয়ে পূর্ব্বাঞ্চল বা বঙ্গদেশাঞ্চলে আশ্রয় লাভেব চেষ্টা করেন। হিন্দু-রাজশক্তির বিরুদ্ধে বৌদ্ধগণের গুপ্তমন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্রের বহু ঘটনা বাংলাদেশেব ইতিহাস পূর্ণ করে রেখেছে।

বৌদ্ধগণ কোনক্রমেই বঙ্গদেশে নিরঙ্কুশ সাধনা ও ধর্ম্মপ্রচাবেব সুযোগ লাভ করলেন না, বরং প্রবলভাবে নিপীড়িত হতে থাকলেন। এই প্রসঙ্গে হিন্দু কর্ত্তৃক বৌদ্ধ-নিপীড়নের একটি কুটিল দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যেতে পারে।

গুপ্ত ও পাল রাজত্বের অবসানের পর, দীর্ঘকাল পরে ব্রাহ্মণ্য -হিন্দু ধর্ম্মের জয় ঘোষিত হল সেনরাজবংশের রাজত্বকালে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ নির্য্যাতনের জন্য বিচিত্র পন্থা অনুসবণ করলেন। রাজ্যময় ঘোষণা করা হল—বৌদ্ধগুরু এবং সিদ্ধাচার্য্যগণকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সঙ্গে শাস্ত্র-পুরাণ ও তন্ত্র বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হতে হবে। তর্কে যদি ব্রাহ্মণ জয়লাভ করেন—পরাজিত বৌদ্ধগুরুকে প্রাণদণ্ড গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু যদি তর্কের জটিল জালে বৌদ্ধগুরু শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন,—তবে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে পরাজিত করার ধৃষ্টতাহেতু বৌদ্ধগুরুকে শিষ্যবর্গসহ তুষানলে দগ্ধ করা হবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবাদবাক্য—"পেছোলে ভেড়ের ভেড়ে, এগোলে নির্ব্বংশের ব্যাটা" এই নীতির কুটিল চক্রান্তজালে বৌদ্ধগণের পক্ষে দেশত্যাগ করে পলায়ন করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু পলায়নপর বৌদ্ধদের পশ্চাদ্ধাবন করেও যথোচিত দণ্ড বিধান করা হতে লাগল।

এই নিপীড়নের হাত থেকে আত্মবক্ষাব জন্য, খণ্ডিত এই বৌদ্ধগণেব অনেকেই (বিশেযতঃ বজ্রযান শাখা) শৈবধর্ম্মের তন্ত্রশাখায় আত্মসমর্পণ কবে। পরবর্ত্তীকালে সহজযানগণ এদের অনুগামী হয়। বিমিশ্র মতধারায় (শৈবধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের মিলনের ফলে জাত মতধারা) শৈব-তান্ত্রিকগণের একাংশ (শৈব ও সহজযান) শৈবনাথপন্থী রূপে বঙ্গদেশের বিভিন্ন আরণ্য এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে গুপ্তমন্ত্র অথবা তন্ত্র-যোগ-সাধনার জন্য আত্মগোপন করে। এই বিচিত্র সমন্বয়ের ফলে শৈবনাথগণের গুরু এবং সহজপন্থীনাথ (বৌদ্ধ)গণের গুরুর নামের মধ্যে সহজেই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে। উভয় ধর্ম্মমতেই একই গুরুর নামের উল্লেখ আছে। কাহ্নপা,

শবরপা, মীননাথ (মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মচ্ছেন্দ্রনাথ বা মাচ্ছিন্দরনাথ) প্রভৃতি নামগুলি তারই দৃষ্টান্ত।

রাঢ়-বঙ্গ, পূর্ব্ব-বঙ্গ, শ্রীহট্ট জেলা, কাছাড়ের পার্ব্বত্য ভূ-ভাগ, কুমিল্লা ও ত্রিপুরার বৃহদংশে শৈবনাথপন্থীদের সাধনপীঠগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে মন্ত্রগুপ্তি ও গুপ্তসাধনার তরঙ্গ ক্রমে রাজানুকূল্যলাভে সমর্থ হয়। উনকোটিকে অনুরূপ কোন সাধনক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করা অযৌক্তিক হবে না। এ কথাও নিশ্চিত সত্য যে, উনকোটির নির্ম্মাণকার্য্য কোনও একটি বিশেষ যুগে সম্পূর্ণ হয়েছে—তা নয়। কয়েক শতাব্দীর সৃষ্টি-প্রচেষ্টার ইতিহাস উনকোটির প্রতিটি শিলা বহন করছে। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, কোনও একটি বিশিষ্ট মতের তন্ত্রসাধনপীঠ রূপেই একদা হয়তো এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু, শতাব্দীর ব্যবধানে, যোগসাধনা, তন্ত্রাচার এবং রসায়ন-পরতন্ত্রতার মাধ্যমে, চিন্তার বিবর্ত্তন যখন সম্ভাবিত হল, তখনই এই সাধন-পীঠের সঙ্গে সমন্বয় সংঘটিত হল বহির্ধর্ম্মের। এর পরিচয়ও উনকোটির মূর্ত্তিগুলি বহন করছে। বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হলেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

গুপ্তযুগের শেষে, পালপর্ব্বের বাংলাদেশে, অঘোর-রুদ্র বা বটুক-ভৈরব কল্পনা প্রসারিত হতে থাকে।[৫] ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় 'বাঙালীর হতিহাস' গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন (পৃঃ ৬১৯-৬২২)। বটুক-ভৈরব বা অঘোর-রুদ্রের মুণ্ডমালা, রুদ্রাক্ষমালা, বিকট হাস্যব্যাদিত আস্য—উনকোটির ভৈরব মূর্ত্তিকেই স্মরণ করায়। পালপর্ব্বের শেষে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর

[৫] বাঙালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃষ্ঠা ৬১৯, ৬২২, ৬৩৭

মধ্যেই, মহেশ্বর ক্রোড়ে উপবিষ্টা 'সুখালীনা উমা'র (উমা-মহেশ্বর বা হরপার্ব্বতী) মূর্ত্তি এই স্থানে অবস্থিত থাকায় যে-কথা প্রমাণিত হয়েছে, তাকে এক কথায় বলা যেতে পারে—শতাব্দী-বাহিত ধর্ম্মচিন্তার প্রবহমানতা। তাই শুধুমাত্র শৈবক্ষেত্র বলে অভিহিত করলেই বোধহয় উনকোটির যথার্থ পরিচয় সমাপ্ত হয় না। এই বিশেষ ধর্ম্মক্ষেত্রের পশ্চাতে একটি জটিল ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাস আবৃত হয়ে রয়েছে। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে,—এই শৈবক্ষেত্রে শিবমূর্ত্তির সঙ্গে বৃহদাকার গণেশমূর্ত্তির অবস্থিতি বিস্ময়জনক। শৈবক্ষেত্রে—পরিবার-দেবতারূপে ক্ষুদ্রতর গণেশমূর্ত্তি অথবা বৃহৎ আকারের গণেশমূর্ত্তির অবস্থান,—বাংলাদেশে সুদুর্লভ 'শৈব-গাণপত্যরীতির' সাক্ষ্য দিচ্ছে। উনকোটির ধর্ম্মক্ষেত্রে যে ধর্ম্মনৈতিক বিপুল বিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছে, সেই বিষয়ে তাই কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।[৬]

এ কথা স্মরণ রাখা ভাল যে গণেশ ও শিবমূর্ত্তির একত্র অবস্থান স্বাভাবিক অবস্থায় বিস্ময়াবহ নয়। কেননা, রাঢ়-বাংলা থেকে সুদূর উত্তর ভারত পর্য্যন্ত শিব-কল্পনার সঙ্গে শক্তিরূপা পার্ব্বতী এবং সিদ্ধিদাতা গণেশ সমভাবে পূজিত। কিন্তু, উনকোটির গণেশ-মূর্ত্তিতে কিছু পৃথক বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। এতদঞ্চলের বিভিন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গের গাত্রদেশে যতগুলি মূর্ত্তি আছে তার মধ্যে শিব এবং গণেশের মূর্ত্তিই বিস্ময়কর রূপে বৃহৎ। এই দুই দেবতার আয়তনের বিপুলতা তাদের প্রাধান্যেরই পরিচায়ক। শৈবধর্ম্মের মধ্যেই তান্ত্রিক যোগাভ্যাস, হঠযোগ, খেচরীমুদ্রাসাধন, মিথুনযোগ এবং উল্টা-সাধন প্রক্রিয়ার যে বীভৎস কাপালিক আচার প্রচলিত

[৬] বাঙালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

ছিল, তার সঙ্গে গণেশের অচ্ছেদ্য যোগ পরবর্ত্তীকালে কল্পিত হয়।

গণেশ 'বিনায়ক'রূপে সর্ব্ববিঘ্ন ও সর্ব্ববিপত্তির দেবতা। আবার মহৎ গুরু রূপে সর্ব্বসিদ্ধি এবং ফলদাতা তিনিই। অতএব যোগ-সাধনায় গণেশের প্রসন্নতা অত্যাবশ্যক বিবেচনায়, শিব-সাধনার সঙ্গে গণেশ দেবতাও যুক্ত হয়ে যান। এইরূপেই গড়ে ওঠে শৈব-গাণপত্য রীতি। বলা বাহুল্য, সমগ্র বঙ্গদেশে এই শৈব-গাণপত্য রীতির পরিচয় অজ্ঞাত না থাকলেও উল্লেখ্য নিদর্শন কোথাও নেই। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এ বিষয়ে বিশেষ দৃঢ়মত প্রকাশ করেছেন তাঁর বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থে। বাংলাদেশের ধর্ম্মনৈতিক জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে,—শৈবনাথপন্থীগণ শিব এবং গণেশকে বন্দনা করেছেন সমভাবেই। নাথধর্ম্মের পবিত্র 'হাড়মালা' গ্রন্থে কখনও 'শিবায় নমঃ' কখনো বা 'গণেশায় নমঃ' প্রভৃতি বন্দনাবাক্যের পর শ্লোক ও ধর্ম্মব্যাখ্যা সুরু হয়েছে। ঊনকোটি তীর্থস্থান তাই শৈবস্থান মাত্রই নয়—শৈবনাথপন্থীদের সাধনপীঠরূপেই এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

উনকোটি ক্ষেত্রে
ধর্ম্মনৈতিক বিবর্ত্তনজাত শৈবনাথপন্থ

প্রারম্ভ পর্ব্বে উনকোটি সম্ভবতঃ শুধুমাত্র শৈবসাধনার একক ক্ষেত্র রূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে উনকোটিতে এখন যে মূর্ত্তিগুলি দেখা যায়—তার মধ্যে অন্ততঃ 'প্রারম্ভ পর্ব্বের' কোন নিদর্শন আছে বলে মনে হয় না। উনকোটির শৈবক্ষেত্র প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ স্বীকৃতিও পেয়েছে। তবে বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, কিম্বা মৎস্যপুরাণের মধ্যে এর কোন উল্লেখ নেই। তবু উনকোটি নিছক শৈবক্ষেত্ররূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মনে করার মধ্যে কোন বাধা নেই—যদিও যুক্তিমতে তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না-হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। পৃথিবীর ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস লক্ষ্য করে দেখা গেছে, অপরিবর্ত্তিত অথবা অবিকৃত আদর্শ নিয়ে পৃথিবীর কোন ধর্ম্মমতই অবিচল ভাবে টিকে থাকতে পারে নি। শৈবক্ষেত্র উনকোটিও তেমনি পারে নি অবিচল ভাবে টিকে থাকতে। তাই শৈবক্ষেত্রে গাণপত্য-রীতির প্রবেশ ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করা গেছে। এই ধর্ম্মক্ষেত্রের বিবর্ত্তন এবং ক্রম-পরিণতি কিন্তু এখানেই স্তব্ধ হয়ে থাকে নি। লোকচক্ষুর অন্তরালে এই ভয়ঙ্কর-দর্শন দেবতারা, বোধ করি, ততোধিক ভয়ঙ্কর মানসিকতা সম্পন্ন ভক্ত-সাধকের পূজা লাভে পরিতৃপ্ত ছিলেন।

কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন ধর্ম্মচর্চ্চায় শান্ত জীবন একদিন বিক্ষিপ্ত হল রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনে। সেন-রাজগণ বঙ্গদেশে সিংহাসন লাভ করার পরই বঙ্গীয় হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের সহযোগিতায় বৌদ্ধ-নিপীড়ন সুরু হয়ে

যায়। মহাযানী-বৌদ্ধগণ ইতিপূর্ব্বেই আত্মক্ষয়ী কলহে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত হয়েছিলেন। পবধর্ম্ম-অসহিষ্ণু তৎকালীন ব্রাহ্মণ-সমাজ, বৌদ্ধগণেব এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নূতন-নূতন আঘাতে জর্জ্জবিত করে তুললেন বৌদ্ধদেব। আত্মরক্ষার প্রেরণায় তাঁরা ত্রিপুরা, আসাম, নেপাল ও ভোট্টদেশে এবং তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে পলায়ন কবলেন' ধর্ম্মহানি কিম্বা প্রাণহানির আশঙ্কা অনেক পরিমাণে দূবীভূত হল, এই সকল অঞ্চলে আত্মগোপন কবার পর।

উনকোটির নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন অঞ্চলে সহজিয়া বৌদ্ধ এবং বজ্রযান সম্প্রদায়েব গুপ্ত-আশ্রয়স্থলগুলি তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্ত্রমার্গে কিছুটা গোপ্যভাব সাধাবণভাবেই এতকাল বর্ত্তমান ছিল। এখন আত্মগোপনের অভিলাষে বৌদ্ধগণ শামুকের মত নিজেকে আবো গুটিয়ে নিয়ে তাঁদেব বাহ্য-পবিচয় লুপ্ত কবে দিতে প্রয়াসী হয়ে পড়েন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিরঙ্কুশ শান্তিলাভে বঞ্চিত হলেন তাঁরা। হিন্দু-তন্ত্রাভিলাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীগুলি, বৌদ্ধদেব অগ্র-পশ্চাৎ আঘাতে ও অত্যাচারে প্রায় অতিষ্ঠ কবে তুলেছিল। অবশেষে, আত্মরক্ষার প্রবল তাড়নায় বৌদ্ধধর্ম্মের এই বিচ্ছিন্ন শাখাগুলি তান্ত্রিক-হিন্দু ধর্ম্মমতেব কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল অনতিবিলম্বে। এবই অনিবার্য ফল রূপে সহজিয়া বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যোগাচারী সন্ন্যাসীব সঙ্গে তন্ত্রযোগী কায়াসাধক শৈবযোগীর মিশ্রণ হল—সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ হল এক বিচিত্র সমন্বয়। এই সমন্বয়-জাত বিশিষ্ট ধর্ম্মমতেব নাম—'শৈবনাথপন্থ'। উনকোটি সেই শৈবনাথপন্থী যোগীদেরই তন্ত্রসাধনপীঠ।

উনকোটির দেবতারা মূক-বিস্ময়ে ভক্তদের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কবে

সেদিন উৎফুল্ল হয়েছিলেন কিম্বা বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন কিনা, কে জানে। খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে, এই অঞ্চলে অন্যান্য তান্ত্রিক দেব-দেবীব প্রতিষ্ঠায় নিজেদের সংখ্যা এবং বলবৃদ্ধিতে হয়তো বা পুলকিতই হয়েছিলেন। কিন্তু সীমিত-জ্ঞান মানবকুলের কাছে তাঁদের ইতিহাস ক্রমেই জটিলতব হয়ে উঠেছিল। সেই ক্রমবর্দ্ধমান ধর্ম্মনৈতিক জটিলতাই উনকোটির প্রকৃত ইতিহাসকে আবৃত কবে বেখেছে।

শৈবপীঠ উনকোটিতে সহজিয়া বৌদ্ধতন্ত্রের প্রবেশ ও সমন্বয় যে যথার্থই সংঘটিত হয়, তাব প্রমাণ উনকোটির দেব-মূর্ত্তিগুলিতেই বর্ত্তমান রয়েছে। হিন্দু এবং বৌদ্ধ—উভয় সম্প্রদায়ের মত-প্রাধান্য এখানে লক্ষ্য কবা যায়। আলোচনাক্রমে এই নিবন্ধে সেই পরিচয় পাওয়া যাবে আবো পরে। তার পূর্ব্বে, উনকোটি বস্তুতঃ শৈবনাথ-পন্থীগণেবই প্রাচীন সাধনপীঠ কিনা তার বিচাব প্রয়োজন। কোন হিন্দু তীর্থরূপে যে এর অস্তিত্ব বজায় থাকে নি—কিম্বা কোন বৌদ্ধ সংঘারাম যে এই স্থান নয়—ইতিপূর্ব্বে তা আলোচিত হয়েছে। এই দেবস্থানকে শৈবনাথপন্থীগণেব সাধনপীঠ মনে করাব পিছনে কয়েকটি বিশেষ কারণ বর্ত্তমান।

প্রথমতঃ এতদঞ্চলে শৈবনাথ ধর্ম্মেব অদ্যাবধি বিপুল বিস্তৃতি এবং নাথ সম্প্রদায়েব প্রসাব লক্ষ্য কববার মতো।

দ্বিতীয়তঃ দেবমূর্ত্তিগুলি নাথধর্ম্মীয় দেবতারূপে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

তৃতীয়তঃ উনকোটির অবস্থানগত স্থানের মধ্যে দুটি স্থান—ধর্ম্মনগর এবং কৈলাসহর নাম বিশেষ অর্থবহ।

চতুর্থতঃ বিপুল ভাস্কর্য্য কর্ম্মে রাজানুকূল্যের পরিচয়।

পঞ্চমতঃ শিবমূর্ত্তি ও গণেশমূর্ত্তির একযোগে বর্ত্তমান থাকা প্রথম কিংবদন্তীর সঙ্গে নাথধর্ম্মীয় কিংবদন্তীর বিশেষ সাদৃশ্য।

উল্লেখিত সূত্রগুলি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এই সূত্রগুলির মধ্যেই উনকোটির যথার্থ পরিচয় নিহিত রয়েছে মনে করা যেতে পারে।

প্রথম সূত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, শুধু রাঢ়-বঙ্গ বা দক্ষিণ বঙ্গাঞ্চল ছাড়াও পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং বঙ্গভুক্ত ত্রিপুরা ও আসাম প্রখণ্ডে শৈবধর্ম্মের মূল জাতীয় জীবনের গভীরে প্রবিষ্ট হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে শিবলিঙ্গ পূজার প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে দামোদরপুরে। ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত-বংশের শেষ নৃপতি বৈন্যগুপ্ত পূর্ব্ব বাংলার শৈবধর্ম্মী নৃপতি ছিলেন। সপ্তম শতকে গৌড়রাজ শশাঙ্ক এবং কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্ম্মা পরম শৈব রূপে খ্যাত। শশাঙ্কের প্রচলিত মুদ্রায় 'মহাদেব' এবং 'নন্দীবৃষ' লাঞ্ছন লক্ষণীয়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাঙ্-এর বিবরণেও শৈবধর্ম্মী ও বৌদ্ধ-বিদ্বেষী শশাঙ্কের উল্লেখ আছে। শৈবধর্ম্মের এই প্রাধান্য হেতু আলোচ্য ধর্ম্মস্থানের মূল আশ্রয় যে শৈবধর্ম্ম-কেন্দ্রিক ছিল—এ কথা মনে করা নিতান্ত অযৌক্তিক হয় না।

উনকোটির মূর্ত্তিগুলির লক্ষণ-বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় সূত্রের সিদ্ধান্তকে পরিপুষ্ট করে। এই লক্ষণগুলির বৈশিষ্ট্য সহসা লক্ষ্যগোচর হয় না। কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করলে এই বিশিষ্টতা দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। যে-কোনও অনভিজ্ঞ দর্শকের কাছেও তখন সেগুলি তাৎপর্য্যমণ্ডিত মনে হবে। ত্রিনেত্র, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, জটামুকুট, বৃষবাহন, ত্রিশূলধৃ ও অক্ষমালা—আপাতভাবে সর্ব্ব-ভারতীয় শিবমূর্ত্তির

প্রধান বৈশিষ্ট্য—এ কথা হিন্দু মাত্রেরই জানা আছে। উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে বিদ্যমান থাকলেও, কিন্তু, তা মুখ্য নয়। অধিকন্তু, শিব-পার্ব্বতীর কর্ণমূলে চক্রাকার কুণ্ডলের অবস্থান—নিঃসন্দেহে এ-যাবৎকাল প্রাপ্ত শিবমূর্ত্তি থেকে এই বিশেষ মূর্ত্তিগুলিকে পৃথক করেছে।

শৈবনাথ-যোগিগণ বিশ্বাস করেছেন—যোগীশ্রেষ্ঠ শিব কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করতেন। 'গোরক্ষবিজয়' বা অন্যান্য নাথ-ধর্ম্মগ্রন্থে শিব-কল্পনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাবে—অনার্য-ধর্ম্ম শিবকে সৃষ্টি করেন। জন্মক্ষণেই শিব শিরে জটা, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা এবং কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করে আবির্ভূত হন।[৭] সেই কারণেই নাথ-যোগী কর্ণে কুণ্ডল পরিধান করতেন কিনা—আজ বলা কঠিন। তবে গোরক্ষপন্থী নাথগণ কর্ণভেদ করে কুণ্ডল পরিধান করতেন। 'কন্‌ফট যোগী' নামে ভারতবর্ষে এক সময়ে তাঁদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সম্ভবতঃ, স্বীয় সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যেই এই রীতির প্রবলতা দেখা দেয়। নাথধর্ম্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুরু জালন্ধরি-পা—নাথ ধর্ম্মে দীক্ষিত যোগী-সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে কর্ণভেদ করে কুণ্ডল ধারণের রীতির প্রবর্ত্তন করেন। তাঁরাই "কন্‌ফট যোগী" নামে পরিচিত।[৮] কেবল

[৭] Obscure Religious Cult,
বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি :—শিবজন্ম বৃত্তান্ত ও কুণ্ডল পরিধান। রাজমোহন নাথ রচিত।

[৮] Obscure Religious Cult—Dr. Sasibhusan Das Gupta.
—পৃষ্ঠা-৩৯১

* কৈলাসহর ধর্ম্মনগর অঞ্চলে শৈবনাথ ধর্ম্মপ্রাধান্য বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষিত হয় রিয়াং জাতির মধ্যে। এই জাতির পুরুষগণ প্রধানতঃ কর্ণমূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকার চক্র পরিধান করে। এই অঞ্চলের অন্যান্য জাতিগুলির

শিবমূর্ত্তিগুলিতেই নয়, অন্যান্য অজ্ঞাতনামা পুরুষ মূর্ত্তিগুলির কর্ণেও কুণ্ডল লক্ষ্য করা যাবে। অথচ, হিন্দু শিবমূর্ত্তি অথবা হিন্দু-বৌদ্ধ মত-সমন্বয়ে গঠিত শিবমূর্ত্তিগুলিতে বিবিধ প্রকার কর্ণাভরণ থাকলেও, চক্রাকার কুণ্ডল ধারণের নিদর্শন এ-পর্য্যন্ত জানা নেই। এখানের অন্যান্য কয়েকটি মূর্ত্তি তান্ত্রিক যোগমুদ্রার পরিচয়-জ্ঞাপক বলে মনে হয়। সেই কারণে, অনুমান করা যেতে পারে, তন্ত্রসাধনায় উন্নতি পরায়ণ শৈবনাথধর্ম্মীগণের সাধনক্ষেত্ররূপে 'ক্রমে এই দেবাসনের পরিণতি লাভ ঘটে। সম্ভবতঃ এককালের বিশুদ্ধ শৈবক্ষেত্র ক্রমেই শৈবনাথ ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে বিবর্ত্তিত হয়ে পড়ে।

উনকোটি শৈবনাথধর্ম্মেরই সাধনক্ষেত্র ছিল—আমাদের এইরূপ ধারণা—বিভিন্ন যুক্তি এবং ইতিহাসেব নানা ঘটনার সমর্থনে ক্রমেই বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। চতুর্থ সূত্রের সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ একটি নব-দিগন্তেব আভাস দিতেও সক্ষম হবে। শৈবনাথ ধর্ম্মক্ষেত্র হলেও উনকোটির নির্ম্মাণকার্য্যের বিশালতা এবং ব্যয়-বাহুল্যবহন কোনক্রমেই নাথ-সিদ্ধাচার্য্যগণের সাধ্যায়ত্ত যে ছিল না—সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। কপর্দ্দকহীন বিষয়বাসনাশূন্য মৃত্যুঞ্জয়ী সাধকবর্গের পক্ষে উক্ত সাধকক্ষেত্রের শিল্প ও ভাস্কর্য্যকর্ম্মের সুবিপুল ব্যয়ভার বহন কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। কেবলমাত্র রাজানুকূল্যেই তা সম্ভব। সাধারণ কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির পক্ষ্যে অর্থদানের ঔদার্য্য যদিও সম্ভব, কিন্তু ভূস্বামী ব্যতীত অর্থ এবং লোকবলের যুগপৎ

মধ্যে তার প্রবর্ত্তন নেই। শৈবনাথপন্থী 'কন্‌ফট' সম্প্রদায়ের চক্রাকার কুণ্ডল পরিধানেব রীতি সম্ভবতঃ উনকোটি ভক্ত রিয়াংদের মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল। বংশপরম্পরায় তারা আজও প্রাচীন ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মক্ষেত্রের পুরাতন ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেছে নিষ্ঠার সঙ্গে।

সহায়তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। উনকোটির ক্ষেত্রেও এইরূপ রাজানুকূল্য বর্ত্তমান বলেই মনে হয়। কয়েক শতাব্দীর ধীর-পদ পথ-পরিক্রমণে এই দেবাসন নির্ম্মিত হয়েছে এ কথা যতখানি সত্য, একটি স্বর্ণোজ্জ্বল যুগে সমধর্ম্মী রাজসহায়তায় যে এর সবিশেষ উন্নতি ঘটে, এ কথাও ততোধিক সত্য।

শৈবধর্ম্মী রাজবংশ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে বর্ত্তমান ছিল—ইতিপূর্ব্বে তা আলোচিত হয়েছে। ধর্ম্মনগর এবং কৈলাসহরের নিকটবর্ত্তী কোন অঞ্চলে অনুরূপ ধর্ম্মাবলম্বী কোন রাজার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব অনুসন্ধানে একটি চমকপ্রদ তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গভুক্ত ত্রিপুরা রাজ্যের চন্দ্রবংশীয় নৃপতি গোবিন্দচন্দ্র (গোপীচন্দ্র) নাথ-সিদ্ধাই ময়নামতীর পুত্র ছিলেন। তিনি স্বয়ং নাথ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে নাথগুরু হাড়িপার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। লোকসাহিত্য-জগতের সুপ্রসিদ্ধ "গোপীচন্দ্র" অথবা ঐতিহাসিক রাজা গোবিন্দচন্দ্র এই ধর্ম্মপ্রচারে ঔৎসুক্য এবং বদান্যতা প্রকাশ করলে তাই বিস্ময়ের কিছু নেই।

পূর্ব্ববঙ্গাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বদিকে "গোবিন্দচন্দ্র" নামক চন্দ্রবংশীয় নৃপতির নাম পাওয়া যায়। ফরিদপুর ও ঢাকা জেলা থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি তাম্রলিপিতে গোবিন্দচন্দ্রের পিতা "ত্রৈলোক্য চন্দ্র" বা "তিলক চাঁদ" নামে খ্যাত। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন—এই তাম্রফলকগুলি দশম-একাদশ শতাব্দীর। গোপীচন্দ্রের পিতৃকুল সম্ভবতঃ গন্ধবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থে (পৃঃ ৪৮৩) এবং ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের Obscure Religious Cult গ্রন্থে (পৃঃ ৩৭৬) এই তথ্য স্বীকৃত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত। অপর ক্ষেত্রে, ইতিহাস

পর্য্যালোচনায় দেখা যায়, গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ এই দুই সহজ-সাধক নাথধর্ম্মীয় গুরু দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

রাজা তিলকচাঁদের মহিষী ও গোপীচন্দ্রের জননী ময়নামতী ছিলেন নাথগুরু গোরক্ষনাথের শিষ্যা। নাথ-সিদ্ধাইগণের অন্যতম হিসাবে তাঁর সুবিপুল খ্যাতির কথাও জানা যায়। সুতরাং, গোরক্ষনাথের শিষ্যা ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্রের পক্ষে দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান থাকা সম্ভবপর বলে মনে হয়। নাথধর্ম্মে দীক্ষিত পূর্ব্ববঙ্গীয় নৃপতি এই গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের পক্ষে উনকোটির নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্রতী হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। নাথধর্ম্মাবলম্বী রাজার দ্বারা নাথধর্ম্ম-পীঠস্থানের নির্ম্মাণকার্য্য সুসম্পন্ন হয়েছে- এ কথা মনে করা তাই অযৌক্তিক হয় না।

পঞ্চম সূত্রের বিশ্লেষণে গণেশ দেবতা এবং শিবমূর্ত্তির এককালীন অবস্থান যে শৈব গাণপত্যরীতির বিশেষ পরিচয় জ্ঞাপক, ইতিপূর্ব্বে সে-কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উনকোটিতে শৈব গাণপত্যরীতির প্রভাব অস্বীকার করে, একটি বিরুদ্ধযুক্তি-প্রয়োগসহ এর বিশ্লেষণে, মূল বিষয়টিকে স্পষ্টতর করে তুলতে সাহায্য করবে। গোবিন্দচন্দ্রই এই দেবাসনের উন্নতিকল্পে ব্রতী হয়েছিলেন, এই মত স্বীকার করেও বলা যেতে পারে, উনকোটির মূল ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁর কোনই সংযোগ ছিল না। বস্তুতঃ বণিকরাজ গোবিন্দচন্দ্র আপন কুলদেবতার প্রতি পক্ষপাতহেতু এই স্থানে গণেশ দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই যুক্তি স্বীকারযোগ্য হয় না। অন্ততঃ উনকোটি-তীর্থ দর্শন করে এসেছেন—এমন যে-

কোন দর্শক নিঃসংশয়ে স্বীকার করবেন, উনকোটির ত্রি-গণেশমূর্ত্তি এতাবৎকাল পরিচিত গণেশমূর্ত্তি অপেক্ষা বিশেষভাবে পৃথক। দণ্ডায়মান অথবা পদ্মাসন গণেশমূর্ত্তিগুলিতে গার্হস্থ্য শান্তভাব অপেক্ষা তান্ত্রিক ভয়াবহতা প্রকট। এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণের পশ্চাতে ভিন্ন প্রকারের ধর্ম্মীয় প্রেরণা বর্ত্তমান ছিল—এ কথা স্বাভাবিক ভাবেই তাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

এ ছাড়া আর একটি কারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যেতে পারে। রাজপ্রাসাদের পারিবারিক দেবতার প্রতি রাজার পক্ষপাতিত্ব যতই তীব্র হোক, গোষ্ঠীজীবনের ধর্ম্মবিশ্বাস যে-দেবস্থানে বিদ্যমান, সেখানে পবিবারগত বা কৌলিক, অথবা ব্যবসায়-(বৃত্তি) গত জীবনে যে দেবতা যুক্ত হয়ে বয়েছেন—তাঁর প্রতিষ্ঠা কোনক্রমেই সম্ভবপব বলে মনে হয় না। গণেশ দেবতার প্রতি রাজ-অনুরাগহেতু, শৈবতান্ত্রিক সাধকবর্গ এবং ভক্ত-সম্প্রদায় ঐ দেবতাকে স্বীয় ধর্ম্মাচরণের অন্তর্ভুক্ত করছেন– পৃথিবীর কোন ধর্ম্মই এরূপ উদার ছিল না। ভারতীয় ধর্ম্মজীবন সাধনায়, যে-কোন যুগে সমন্বয় বা গ্রহণ অথবা বর্জ্জন, যাই ঘটে থাকুক না কেন—তার পিছনে প্রাকৃতিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা কালিক যে কোন দারুণ বিপর্য্যয় সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান থেকেছে। এইরূপ ঘটনার অনিবার্য্যতা ভারতবর্ষেব ইতিহাসেব পৃষ্ঠায় অপ্রতুল দৃষ্টান্ত রাখে নি। সুতরাং, এরূপ দৃষ্টান্ত প্রয়োগের চেষ্টা যথার্থই দুর্ব্বল যুক্তি বলে ধবে নিলে অন্যায় হবে না।

তদুপরি, আরও একটি কারণ নির্দ্দেশ করা যেতে পারে—প্রাচীন ভাস্কর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ ত্রি-গণেশের মূর্ত্তি ব্যতীত অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন যুগের সৃষ্টি একটি গণেশমূর্ত্তি সেখানে রয়েছে। সেই

মুর্ত্তিটির নির্ম্মাণ-কৌশল, অলঙ্করণ-রীতি, ও মুদ্রাভঙ্গীতে আধুনিকতার ছাপ অস্পষ্ট নয়। উনকোটি ক্ষেত্রের ধর্ম্মসাধনায় পরবর্ত্তী যুগেও গণেশ দেবতা যে অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গৃহীত—এই অনুমান করা নিশ্চয় ভুল হবে না। তাই রাজপ্রভাব নয়—স্বাভাবিক ধর্ম্মীয় প্রভাবেই গণেশমুর্ত্তির স্থান হয়েছে এই শৈবক্ষেত্রে। উপযুক্ত গবেষণাকার্য্য হলে বঙ্গদেশে বহুশ্রুত শৈব-গাণপত্যরীতির একটি দুর্লভ নিদর্শনরূপে এই ধর্ম্মক্ষেত্র বাংলাদেশের ধর্ম্মসাধনার একটি অমূল্য তথ্যকে অনাবৃত করতে পারবে বলে মনে হয়।

নাথ ধর্ম্মগ্রন্থে নির্দ্দিষ্টভাবে উনকোটির নাম কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। ষষ্ঠ সুত্রে কিংবদন্তী প্রসঙ্গে নাথধর্ম্মে প্রচলিত একটি কিংবদন্তীর কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দুমাত্রেই এ কথা জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে, বৈদিক ও বামায়ণ-মহাভারতের যুগের মুনি-ঋষিগণ অলৌকিক যোগবলে বলীয়ান ছিলেন। যোগীপ্রবর মহাঋষি বশিষ্ঠ অনুরূপ শক্তির অধিকারী ছিলেন পূর্ব্বাপর কালে এ কথা বিশ্বাস করা হয়। নাথধর্ম্মীয় সিদ্ধপুরুষগণ বিশ্বাস করতেন যে, (আধুনিক কালেও যেমন মনে করা হচ্ছে, তন্ত্রধারণা আদৌ ভারতের মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণ করে নি। বহির্ভারত —সম্ভবতঃ চীন বা তিব্বত অথবা হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলের কোন দেশ থেকে এই ধারণা এতদঞ্চলে প্রবিষ্ট হয়)—বশিষ্ঠদেব সৌরমুখী পূর্ব্বদিগবর্ত্তী বহির্ভারতীয় কোন দেশ থেকে যোগ শিক্ষা করে আসার জন্য আদিষ্ট হন। নাথধর্ম্মে কিংবদন্তীর সঙ্গে বশিষ্ঠ মুনিও আশ্চর্য্য ভাবে যুক্ত হয়ে আছেন।

যোধপুরের রাজা মানসিংহ সংকলিত, সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাথধর্ম্ম সংক্রান্ত আর একটি গ্রন্থের নাম—'শ্রীনাথ তীর্থাবলী'।

এই গ্রন্থে বঙ্গদেশান্তর্গত 'বিশালকা'* নামক পুণ্যস্থানে শ্রীনাথ হাদেবের কথা-প্রসঙ্গে—আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথমোক্ত কিংবদন্তীব কটি লোক-কথা প্রচলিত আছে :—

"বিশালকার মহানাদ অঞ্চলে দ্বিতীয় একটি কাশীধাম প্রতিষ্ঠামানসে মহাঋষি বশিষ্ঠ যোগবলে ত্রেত্রিশ কোটি দেবতাকে আনয়ন করেন। কিন্তু যোগীশ্রেষ্ঠ শিবকে ধরে রাখতে পারলেন না। কাকরূপ ধারণ করে শিব অতঃপর কৈলাসে চলে যান। তথাপি সেখানে 'বহতি গঙ্গা বাশিষ্ঠি নির্ম্মলা তত্র সজলা'—এবং সেই পুণ্য সিদ্ধাসনে 'বৈরাগ্যমাগি যোগীনাম্ অধিকার'।"...এই কিংবদন্তীর অংশ বিশেষের সঙ্গে আলোচ্য মুল কিংবদন্তীর অংশ-বিশেষের সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো। উনকোটিতে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত একটি বায়সমূর্ত্তি ধর্ম্মনগর ও কৈলাসহরের প্রাচীন ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ করেছেন বলে প্রকাশ করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এইরূপ কোন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে এ কথা সত্য যে, নাথধর্ম্মের সঙ্গে স্বাভাবিক কাহিনী-সাদৃশ্য-হেতু কিংবদন্তীর আড়ালে যে ইতিহাসের একটি ঘটনা আত্মগোপন করে আছে এবং তা যেন শৈবনাথতন্ত্রের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেছে বলে মনে হয়। কয়েক শতাব্দীর ঐতিহ্যের বাহক উনকোটির ধর্ম্মক্ষেত্র, শম্বুকগতিতে নানা বিবর্ত্তনকে স্বীকার করেই অগ্রসর হয়েছে। সেই বিবর্ত্তনজাত উনকোটির ধর্ম্মমত শেষ পর্য্যন্ত যোগতন্ত্র ও রসায়ন পরতন্ত্র শৈবনাথ যোগী বা কাপালিকগণের সাধনপীঠরূপে পরিণত হয়েছে—এতে কোন সন্দেহ নেই।

* বিশালকা এবং মহানাদ সম্ভবতঃ হুগলী জেলার কোন স্থানে অবস্থিত।

উনকোটি ? না, শূন্যকূট !

ভারতবর্ষের ক্ষীণ-গরিমা ও অল্পখ্যাত দেবস্থানগুলির অবস্থা, অনেকখানি যেন বঙ্গ-পরিবারভুক্ত অশীতিপর বৃদ্ধ সদস্যের মতো। হতাদর সেই বৃদ্ধদের গৃহ-সংসার থেকে পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় না—অথচ সমগ্র পরিবারে সর্ব্বক্ষণের ও সর্ব্বজনের চক্ষুশূলরূপে তাঁরা সকরুণ কুণ্ঠায় কোনমতে বেঁচে থাকেন। সর্ব্বক্ষেত্রে এ কথা নিশ্চয় সত্য নয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অবমাননার হাত থেকে খুব অল্প সংখ্যক এঁদের রক্ষা পেয়েছেন। বাংলা দেশের সহস্র-সহস্র গ্রাম-জনপদে অসংখ্য দেবমন্দির অথবা দেবমূর্ত্তিগুলিরও এই দুরবস্থা। এমনকি সরকারী অথবা ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের সংগ্রহশালায় স্থানাভাবহেতু উন্মুক্ত অঙ্গনে নিতান্ত অবহেলায় তাঁদের দণ্ডায়মান অবস্থায় অপেক্ষা করতে দেখা যায়। দেব-বিগ্রহের এই প্রাত্যহিক নিগ্রহ অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন। সংগৃহীত দেবমূর্ত্তিই যখন এবম্বিধ বিড়ম্বিত জীবন যাপন করেন, তখন উনকোটির অরণ্যাবৃত দুর্গম পর্ব্বতে কতিপয় সৌন্দর্য্যহীন ভীম-দর্শন দেবমূর্ত্তির নির্য্যাতন ভোগ যে কিরূপ চরম অবস্থায় উপনীত হয়েছে—তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

শুধুমাত্র উনকোটিতেই নয়—এর পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য অনেকগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গের গাত্রদেশে অনুরূপ ভাস্কর্য্য কর্ম আছে। পার্ব্বত্য অধিবাসীদের নিকটে এই সংবাদ পাওয়া গেছে। সেগুলি আজও অনাবিষ্কৃত হয়েই রয়েছে। উপযুক্ত সন্ধানকার্য্য হলেও, পার্শ্ববর্ত্তী

অন্যান্য পর্ব্বতগুলির মূর্ত্তি এবং এ-যাবৎ উনকোটিতে বর্ত্তমান মূর্ত্তিগুলির শ্রীহট্ট তথা ত্রিপুরার কিম্বা বৃহত্তর অর্থে বাংলাদেশের ধর্ম্মনৈতিক জীবনের নূতন দিগন্ত-সন্ধান দিতে পারবে—নির্দ্বিধ হয়েই এ কথা বলা যায়।

উনকোটির অনাদৃত অবহেলিত মূক দেবতাগণ আজ প্রকৃতির দ্বারা লাঞ্ছিত। কত শতাব্দীর লাঞ্ছনা সহ্য করে, অভিমানহত দেবতাগণ বিধ্বস্ত হতে চলেছেন। অদূর ভবিষ্যতে প্রবল বর্ষা এবং খররৌদ্র তাপে হয়তো বা তাঁদের পূর্ণ ধ্বংসাবস্থা আসন্ন। অরণ্যচারী সেই প্রাচীন ভক্ত কাপালিকেরা বহুকাল হল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন। তাই বিগ্রহগুলির প্রাত্যহিক পরিচর্য্যার জন্য আজ কোন লোক নেই। ভক্তি আর মমতাপূর্ণ কোন হস্ত আজ আর তাঁদের গাত্রমার্জ্জনা করে না—তাই তাঁদের দেহগুলি সলজ্জভাবে লুকিয়ে আছে আগাছা আর শৈবালের আড়ালে। উনকোটির বিষয়ে গবেষণা যথার্থই প্রয়োজন—তবু, তা যদি এখনই সম্ভবপর না-ও হয়,—প্রাচীন বাঙালীর ধর্ম্মজীবনের সাক্ষ্য বহন করে যে-দেবমূর্ত্তিগুলি বহু শতাব্দীর প্রাকৃতিক লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন, তাঁদের সংরক্ষণের দায়িত্ব আজ নিতান্তই আবশ্যক।

দেবমূর্ত্তিকে লাঞ্ছিত করার ধৃষ্টতা তো কেবল প্রকৃতির একচেটিয়া অধিকার নয়। মানুষ আজ এই বিষয়ে প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। উনকোটিতে মাঝে মাঝে দর্শকবৃন্দ আসেন। উনকোটি দর্শনে তাঁরা মুগ্ধ হন কতটুকু জানি না, কিন্তু সহস্র বৎসরের মহিমার পাশে নিজেদের তুচ্ছ নামগুলি স্মরণীয় করে রাখার জন্য মূর্ত্তিগুলির অঙ্গে ছুরি দিয়ে তাঁদের নাম লিখে গেছেন। কীর্ণ-কলা বা খোদাই কর্ম্মে তাঁদের বিপুল

পারদর্শিতাব ফলে মূর্ত্তিগুলিব বাহু, বক্ষ এবং পৃষ্ঠ ক্ষতবিক্ষত। অনেক বনভোজন-বিলাসী আবাব ভগ্নমূর্ত্তিগুলিব খণ্ডাংশ দিয়ে চমৎকাব উনান প্রস্তুত কবে রন্ধনাদি কবে তৃপ্তি পান। প্রস্তবীভূত বটুক ভৈরব বা উনকোটীশ্বব শিব ভয়ঙ্কব দর্শন আকৃতিব অধিকার নিয়ে থাকলেও, সম্পূর্ণ শক্তিহীন—তাই দুষ্কৃতিকাবীগণ তাঁদের অভিশাপেব ভযে ভীত হন না। কিন্তু ভীত হবেন তিনিই—উনকোটিব সুপ্রাচীন মহিমা স্মবণ কবে যিনি সশ্রদ্ধচিত্ত। দেবতাব বোষ বা অভিশাপেব ভযে নয—প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি বিনষ্ট হয়ে যাবে বলে—হাজার বৎসব পূর্ব্বেব ধর্ম্মজীবন এবং সভ্যতাব ইতিহাস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায।

বাবংবাব একটি বিষযে আলোকপাতেব চেষ্টা কবা হযেছে এই প্রবন্ধে যে, উনকোটিক্ষেত্র কোন একটি বিশেষ যুগেব এককালীন সৃষ্টি নয়। বহু শতাব্দীব বিভিন্ন মতধাবাব সংমিশ্রণে সমন্বয়জনিত এক ক্রমিক বিবর্ত্তনেব ফলেই উনকোটিব নির্ম্মাণ কার্য্যের পবিপূর্ণতা লাভ ঘটে। বৈদিক অথবা প্রাক্-বেদ পর্ব্বেব পশুপতিনাথ কল্পনা[১], অথবা দক্ষিণ ভাবতীয রুদ্র কল্পনাব

[১] Vedic Age— Dr. R. C. Majumdar, page 190 : The Indus Valley Civilisation (Harappa—Mahenjo-daro) 'Among the male gods the most remarkable is a three-faced deity wearing a horned head-dress, seated cross-legged on a throne with 'Penis-erectus' and surrounded by elephant, tiger, buffalo and rhinoceros with deer appearing under the seat...This representations has at least three concepts which are usually associated with Siva,

সঙ্গে উনকোটির শিব-কল্পনার সঙ্গতি অত্যন্ত ক্ষীণ, অথবা আরও স্পষ্ট করে 'অনুপস্থিত' বলাই সঙ্গত। কিন্তু বাংলা দেশের শিব-কল্পনার সঙ্গে 'পাল পর্ব্বের' অঘোর রুদ্র বা বটুক ভৈরবের বিমিশ্র চিন্তা যোগধর্ম্মপরায়ণ শৈবধর্ম্মের ভিত্তিকে দৃঢ়মূল করেছে। শৈবধর্ম্মের সঙ্গে অপর এক ধর্ম্ম (সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম) মতের সমন্বয়েই শৈব-নাথধর্ম্মের সমন্বিত পরিণতি শৈবনাথপন্থার উদ্ভব। এই ধর্ম্মক্ষেত্রের বিবর্ত্তন এবং ক্রমপরিণতি কোথাও স্তব্ধ হয়ে থাকে নি। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত বজ্রযান ও সহজযান শাখার ধর্ম্ম-চিন্তার বিমিশ্রণ শৈব-বৌদ্ধ মিলন সম্ভাবিত করে শৈবনাথপন্থার উদ্ভব করেছে।

উনকোটির দেবমূর্ত্তিগুলি নাথ-পন্থের দেবতার সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্য যুক্ত—একথা দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যাবে—প্রায় ২৫ ফুট উচ্চ একক মুণ্ডাকৃতি দেবতা এই মতেরই সমর্থন করে। দংষ্ট্রাব্যাদিত বিকট দর্শন এই মূর্ত্তিটির দুই পার্শ্বে দুটি বৃহৎ নারীমূর্ত্তি সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় লীলায়িত ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। বলা বাহুল্য, মূর্ত্তি দুটি পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত বা উৎকীর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর এই কারণে যে, শিবমূর্ত্তি গঠনে যে অমসৃনতা এবং পরিমিতিবোধের অভাব রয়েছে নারীমূর্ত্তি দুটির সুবৃৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সেই তুলনায় সুপরিমিত এবং সুগঠিত। (সম্ভবতঃ মূল মূর্ত্তির পার্শ্বে এই দুটি পরবর্ত্তী কালের সংযোজন।) তন্ত্রমার্গে ঈড়া-পিঙ্গলাকে ডাকিনী ও সরস্বতী নাড়ী রূপে যে কল্পনা করা

---

viz., that he is (1) *Trimukha* (three-faced), (ii) *Pasupati* (Lord of Animals) and (iii) *Yogiśvara or Mahāyogī.*

পারদর্শিতার ফলে মূর্ত্তিগুলির বাহু, বক্ষ এবং পৃষ্ঠ ক্ষতবিক্ষত। অনেক বনভোজন-বিলাসী আবার ভগ্নমূর্ত্তিগুলির খণ্ডাংশ দিয়ে চমৎকার উনান প্রস্তুত করে রন্ধনাদি করে তৃপ্তি পান। প্রস্তরীভূত বটুক ভৈরব বা উনকোটীশ্বর শিব ভয়ঙ্কর দর্শন আকৃতির অধিকার নিয়ে থাকলেও, সম্পূর্ণ শক্তিহীন—তাই দুষ্কৃতিকারীগণ তাঁদের অভিশাপের ভয়ে ভীত হন না। কিন্তু ভীত হবেন তিনিই—উনকোটির সুপ্রাচীন মহিমা স্মরণ করে যিনি সশ্রদ্ধচিত্ত। দেবতার রোষ বা অভিশাপের ভয়ে নয়—প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি বিনষ্ট হয়ে যাবে বলে—হাজার বৎসর পূর্ব্বের ধর্ম্মজীবন এবং সভ্যতাব ইতিহাস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায়।

বারংবার একটি বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে যে, উনকোটিক্ষেত্র কোন একটি বিশেষ যুগেব এককালীন সৃষ্টি নয়। বহু শতাব্দীর বিভিন্ন মতধারার সংমিশ্রণে সমন্বয়জনিত এক ক্রমিক বিবর্ত্তনের ফলেই উনকোটির নির্ম্মাণ-কার্য্যের পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে। বৈদিক অথবা প্রাক্-বেদ পর্ব্বের পশুপতিনাথ কল্পনা[১], অথবা দক্ষিণ ভারতীয় রুদ্র কল্পনার

---

[১] Vedic Age— Dr. R. C. Majumdar, page 190 : The Indus Valley Civilisation (Harappa—Mahenjo-daro) 'Among the male gods the most remarkable is a three-faced deity wearing a horned head-dress, seated cross-legged on a throne with 'Penis-erectus' and surrounded by elephant, tiger, buffalo and rhinoceros with deer appearing under the seat...This representations has at least three concepts which are usually associated with Siva,

সঙ্গে উনকোটির শিব-কল্পনার সঙ্গতি অত্যন্ত ক্ষীণ, অথবা আরও স্পষ্ট করে 'অনুপস্থিত' বলাই সঙ্গত। কিন্তু বাংলা দেশের শিব-কল্পনার সঙ্গে 'পাল পর্ব্বের' অঘোর রুদ্র বা বটুক ভৈরবের বিমিশ্র চিন্তা যোগধর্ম্মপরায়ণ শৈবধর্ম্মের ভিত্তিকে দৃঢ়মূল করেছে। শৈবধর্ম্মের সঙ্গে অপর এক ধর্ম্ম (সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম) মতের সমন্বয়েই শৈব-নাথধর্ম্মের সমন্বিত পরিণতি শৈবনাথপন্থার উদ্ভব। এই ধর্ম্মক্ষেত্রের বিবর্ত্তন এবং ক্রমপরিণতি কোথাও স্তব্ধ হয়ে থাকে নি। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত বজ্রযান ও সহজযান শাখার ধর্ম্ম-চিন্তার বিমিশ্রণ শৈব-বৌদ্ধ মিলন সম্ভাবিত করে শৈবনাথপন্থার উদ্ভব করেছে।

উনকোটির দেবমূর্ত্তিগুলি নাথ-পন্থের দেবতার সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্য যুক্ত—একথা দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যাবে—প্রায় ২৫ ফুট উচ্চ একক মুণ্ডাকৃতি দেবতা এই মতেরই সমর্থন করে। দংষ্ট্রাব্যাদিত বিকট দর্শন এই মূর্ত্তিটির দুই পার্শ্বে দুটি বৃহৎ নারীমূর্ত্তি সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় লীলায়িত ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। বলা বাহুল্য, মূর্ত্তি দুটি পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত বা উৎকীর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর এই কারণে যে, শিবমূর্ত্তি গঠনে যে অমসৃনতা এবং পরিমিতিবোধের অভাব রয়েছে নারীমূর্ত্তি দুটির সুবৃৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সেই তুলনায় সুপরিমিত এবং সুগঠিত। (সম্ভবতঃ মূল মূর্ত্তির পার্শ্বে এই দুটি পরবর্ত্তী কালের সংযোজন।) তন্ত্রমার্গে ঈড়া-পিঙ্গলাকে ডাকিনী ও সরস্বতী নাড়ী রূপে যে কল্পনা করা

---

viz., that he is (i) *Trimukha* (three-faced), (ii) *Pasupati* (Lord of Animals) and (iii) *Yogiśvara or Mahāyogī.*

হয়েছে, এই দুটিকে তাদেরই সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মনে হয়। মধ্যভাগে অবধূত-শিব স্বয়ং সুষুম্না বা অবধূতিকা মার্গের সংকেত রূপে বিরাজিত। ললনা-রসনা-অবধূতিকা মার্গীয় দেহসাধনা সহজপন্থী বৌদ্ধগণের মধ্যেই বিশেষভাবে আদৃত ছিল। কালক্রমে নাথ-পন্থীগণ অবধূত-সাধনাকে অবশ্য আচরণীয় বলেই গ্রহণ করেন। সুতরাং নাথধর্ম্মীয় দেবতারূপে এগুলিকে গ্রহণ করাই সমীচীন।

মূর্ত্তিগুলির মধ্যে বহু পুরুষ মূর্ত্তির কর্ণে চক্রাকার কুণ্ডলের অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। যে বিশাল মুণ্ডদ্বয়কে শিব ও পার্ব্বতীর মুণ্ড বলে এই প্রবন্ধে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার কর্ণাভরণেও একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শিবমূর্ত্তির কপাট-সদৃশ্য বিশাল কর্ণদ্বয়ের কুণ্ডল দুটি যদিও চক্রাকার, কিন্তু তাদের নক্সা (Design) অংশতঃ পৃথক। কোন ভাস্কর্য্য কর্ম্মেই অদ্যাবধি এই বৈপরীত্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সাধারণতঃ সামঞ্জস্য বিধানই শিল্পকর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। স্বাভাবিক ভাবেই তাই মনে হয়, এই বৈপরীত্য সৃষ্টি শিল্পীর অনবধানজনিত আকস্মিক সৃষ্টি নয়। বরং নিগূঢ় তাৎপর্য্যবাহী। এই প্রসঙ্গে শিবকর্ণের কর্ণাভরণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ আবশ্যক।

দক্ষিণ ভারতীয় নটরাজ কল্পণায়—অবশ্য নটরাজ শিবের দুই কর্ণে দুইটি ভিন্ন আভরণের চিন্তা বর্ত্তমান। দুটি ভিন্ন কর্ণাভরণ পরিধান করেন মহাশিব। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কালে এই দুটি স্ত্রী (প্রকৃতি) এবং পুরুষের প্রতীকরূপে শিবকর্ণে স্থান লাভ করে।[১০] নাথযোগিগণও বিশ্বাস করেন—সহজাত কুণ্ডলধারী

[১০] স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত "সঙ্গীত ও সংস্কৃতি" গ্রন্থ, পৃষ্ঠা—১৭৩ :—

শিবের এক কর্ণে সূর্য্য এবং অপর কর্ণে চন্দ্র আভরণরূপে অবস্থিত।[১১] যৌগিক সাধনার গূঢ়তত্ত্বে "সূর্য্য ও চন্দ্র" নাম দুটি নাথ যোগিগণ বারংবার ব্যবহার করেছেন। এমনকি নাথধর্ম্মে এমন কথাও বিশ্বাস করা হয় যে—যোগবলে পরম শক্তিমান হাড়িপা চন্দ্র এবং সূর্য্যকে আকর্ষণ করে স্বীয় কর্ণের কুণ্ডলরূপে ব্যবহার করেছেন।[১২] ঊনকোটির শিবের কর্ণে অবস্থিত কুণ্ডল যদি সেই গভীর অর্থের দ্যোতক হয়ে থাকে—তবে নাথ-তীর্থাসন রূপে ঊনকোটিকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

শৈবপীঠ ঊনকোটিতে একদা যেমন গাণপত্যরীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল—তেমনি সহজিয়া বৌদ্ধতন্ত্রের প্রবেশ ও সমন্বয় পরবর্ত্তী-কালে নিঃসন্দেহেই সাধিত হয়েছে। তাই হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মত-প্রাধান্য এখানে লক্ষ্য করবার মতো। আলোচনায় তৃতীয় সূত্র সন্ধানে সেই কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। লক্ষ্য করা যাবে, ঊনকোটি ক্ষেত্রের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী দুটি জনপদের নাম যথাক্রমে "কৈলাসহর এবং ধর্ম্মনগর"। নাম দুটির তাৎপর্য্য বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয়।

'শ্রীনাথ তীর্থাবলী'তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বশিষ্ট মুনির যোগবলে আকৃষ্ট হয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতা ঊনকোটিতে উপস্থিত হতে বাধ্য হন। কিন্তু পরমযোগী শিবকে ধরে রাখা যায় নি। কাকরূপ ধারণ করে শিব কৈলাস-স্থানে উড়ে চলে গিয়েছিলেন।

'দক্ষিণ কর্ণে মনুষ্যদেহের ও বামকর্ণে নারীদেহের ভূষণ' ধারণ করেন।

[১১] Obscure Religious Cult.

[১২] Obscure Religious Cult.

হয়েছে, এই ছুটিকে তাদেরই সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মনে হয়। মধ্যভাগে অবধূত-শিব স্বয়ং সুষুম্না বা অবধূতিকা মার্গের সংকেত রূপে বিরাজিত। ললনা-রসনা-অবধূতিকা মার্গীয় দেহসাধনা সহজপন্থী বৌদ্ধগণের মধ্যেই বিশেষভাবে আদৃত ছিল। কালক্রমে নাথ-পন্থীগণ অবধূত-সাধনাকে অবশ্য আচরণীয় বলেই গ্রহণ করেন। সুতরাং নাথধর্ম্মীয় দেবতারূপে এগুলিকে গ্রহণ করাই সমীচীন।

মূর্ত্তিগুলির মধ্যে বহু পুরুষ মূর্ত্তির কর্ণে চক্রাকার কুণ্ডলের অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। যে বিশাল মুণ্ডদ্বয়কে শিব ও পার্ব্বতীর মুণ্ড বলে এই প্রবন্ধে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার কর্ণাভরণেও একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শিবমূর্ত্তির কপাট-সদৃশ্য বিশাল কর্ণদ্বয়ের কুণ্ডল ছুটি যদিও চক্রাকার, কিন্তু তাদের নক্সা (Design) অংশতঃ পৃথক। কোন ভাস্কর্য্য কর্ম্মেই অদ্যাবধি এই বৈপরীত্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সাধারণতঃ সামঞ্জস্য বিধানই শিল্পকর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। স্বাভাবিক ভাবেই তাই মনে হয়, এই বৈপরীত্য সৃষ্টি শিল্পীর অনবধানজনিত আকস্মিক সৃষ্টি নয। বরং নিগূঢ় তাৎপর্য্যবাহী। এই প্রসঙ্গে শিবকর্ণের কর্ণাভরণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পবিচয় গ্রহণ আবশ্যক।

দক্ষিণ ভারতীয় নটবাজ কল্পণায—অবশ্য নটবাজ শিবের ছুই কর্ণে ছুইটি ভিন্ন আভরণের চিন্তা বর্ত্তমান। ছুটি ভিন্ন কর্ণাভরণ পরিধান করেন মহাশিব। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কালে এই ছুটি স্ত্রী (প্রকৃতি) এবং পুরুষের প্রতীকরূপে শিবকর্ণে স্থান লাভ করে।[১০] নাথযোগিগণও বিশ্বাস করেন—সহজাত কুণ্ডলধারী

[১০] স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত "সঙ্গীত ও সংস্কৃতি" গ্রন্থ, পৃষ্ঠা—১৭৩ :—

শিবের এক কর্ণে সূর্য্য এবং অপর কর্ণে চন্দ্র আভরণরূপে অবস্থিত।[১১] যৌগিক সাধনার গূঢ়তত্ত্বে "সূর্য্য ও চন্দ্র" নাম দুটি নাথ যোগিগণ বারংবার ব্যবহার করেছেন। এমনকি নাথধর্ম্মে এমন কথাও বিশ্বাস করা হয় যে—যোগবলে পরম শক্তিমান হাড়িপা চন্দ্র এবং সূর্য্যকে আকর্ষণ করে স্বীয় কর্ণের কুণ্ডলরূপে ব্যবহার করেছেন।[১২] ঊনকোটির শিবের কর্ণে অবস্থিত কুণ্ডল যদি সেই গভীর অর্থের দ্যোতক হয়ে থাকে—তবে নাথ-তীর্থাসন রূপে ঊনকোটিকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

শৈবপীঠ ঊনকোটিতে একদা যেমন গাণপত্যরীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল—তেমনি সহজিয়া বৌদ্ধতন্ত্রের প্রবেশ ও সমন্বয় পরবর্ত্তী-কালে নিঃসন্দেহেই সাধিত হয়েছে। তাই হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েব মত-প্রাধান্য এখানে লক্ষ্য করবার মতো। আলোচনায় তৃতীয় সূত্র সন্ধানে সেই কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। লক্ষ্য করা যাবে, ঊনকোটি ক্ষেত্রের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী দুটি জনপদের নাম যথাক্রমে "কৈলাসহর এবং ধর্ম্মনগর"। নাম দুটির তাৎপর্য্য বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয়।

'শ্রীনাথ তীর্থাবলী'তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বশিষ্ট মুনির যোগবলে আকৃষ্ট হয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতা ঊনকোটিতে উপস্থিত হতে বাধ্য হন। কিন্তু পরমযোগী শিবকে ধরে রাখা যায় নি। কাকরূপ ধারণ করে শিব কৈলাস-স্থানে উড়ে চলে গিয়েছিলেন।

'দক্ষিণ কর্ণে মনুষ্যদেহের ও বামকর্ণে নারীদেহেব ভূষণ' ধারণ করেন।

[১১] Obscure Religious Cult.

[১২] Obscure Religious Cult.

যোগতন্ত্রের পরমতম উৎপত্তিস্থল ও আশ্রয়স্থল এই কৈলাসে। সেই কৈলাসে বাস করেন যোগিরাজ শিব স্বয়ং। শৈবনাথ-পন্থীর নিকটে তাই কৈলাস-নিবাসী সেই শিব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং যোগমার্গে আদিগুরু। হিন্দু-তন্ত্রাশ্রয়ী তান্ত্রিক-বৌদ্ধ তথা শৈবনাথপন্থী তান্ত্রিক কপালির নিকট যোগিশ্রেষ্ঠ 'হর' এবং তাঁর আবাসস্থল 'কৈলাসে'র প্রতি শ্রদ্ধা সমভাবেই প্রধান। তাই বলে এই সূত্রাবলম্বনে শিবোপাসকের শিবাসনের নাম 'কৈলাস-সহর' ক্রমে উচ্চারণ-বিকৃতি হেতু 'কৈলা-সহর' রূপান্তর গ্রহণ করেছে, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। কেননা 'তুর্কী আক্রমণ' বাংলা দেশে সংঘটিত হয়েছে মাত্র ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তার পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় মুসলমান শব্দ (আরবী বা ফরাসী বা তুর্কী শব্দ) প্রবিষ্ট হবার কোন সুযোগ থাকতে পারে না। আনুমানিক দশম-একাদশ শতকে ফারসী শব্দ 'সহ্‌র" নিঃসন্দেহে প্রচলিত হয় নি। সেই কারণে মনে হয়—যোগিরাজ শিবের কথা স্মরণ রেখেই তন্ত্র-যোগসাধনার অন্যতম কেন্দ্রস্থল উনকোটি পর্ব্বতশৃঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী অনুরূপ কোন সাধনাক্ষেত্র রূপে এই স্থানের নামকরণ হয়েছিল 'কৈলাস-হর বিহার'। কালক্রমে এই নামই কৈলা-সহর রূপে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে এইরূপ উচ্চারণ বিপর্য্যয়জনিত অর্থ-রূপান্তর অযৌক্তিক বলা চলে না।

ধর্ম্মনগর নামটির পশ্চাতেও অনুরূপ তাৎপর্য্য বর্ত্তমান। শৈবনাথ-পন্থী ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উভয়ের মধ্যেই "ধর্ম্ম" নামটি বিশেষ মূল্য বহন করে। ধর্ম্মনগর নামের পশ্চাতে তাই শৈবধর্ম্মের আশ্রয়ে ক্রম-বিলীয়মান বৌদ্ধ প্রভাব অংশতঃ লক্ষ্য করা যেতে

পারে। বৌদ্ধধর্ম্মের বিশিষ্ট 'ত্রি-রত্ন'-এর মধ্যে বুদ্ধং শরণং ধর্ম্মং শরণং ও সংঘং শরণং বাণী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি বাণীর মধ্যে "ধর্ম্মং শরণং" বাণী সর্ব্বাধিক মূল্যবান—কেননা ধর্ম্মের অনুশাসনের মাধ্যমেই জীবের নির্ব্বান লাভ সম্ভব। ধর্ম্মের মধ্যেই যথার্থ জীবনচর্চ্চার (Practices) কথা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। ধর্ম্মই (পালিতে যাকে বলা হয় ধম্ম) সাধকের জীবনে প্রধান। তার প্রধান কারণ হল—পার্থিব দুঃখময় জীবন-অস্তিত্বের মূল যে তৃষ্ণা, তাকে বিনষ্ট করে শীল—চিত্ত এবং প্রজ্ঞা (ক্রিয়া —চিন্তা এবং জ্ঞান বোধি) লাভ করার জন্য অষ্টমার্গীয় সাধনার প্রয়োজন। এই সাধনার পথ-নির্দ্দেশ করা হয়েছে 'ধম্ম'-এর মধ্যে। বৌধ মতাবলম্বীর পক্ষে বুদ্ধ ও সংঘ ব্যতীত অন্যতম প্রধান আশ্রয় এই ধর্ম্ম। অতএব, হিন্দু ব্রাহ্মণেব দ্বারা লাঞ্ছিত-বিতাড়িত বৌদ্ধগণ, কোন দুর্গম স্থলে আত্মগোপন করে যদি সাধনক্ষেত্র নির্ম্মাণ করেন—এবং সেই স্থানের যদি নামকরণ হয় 'ধর্ম্মনগর' —তবে অবিশ্বাস করার হেতু নেই।

শৈবনাথপন্থীগণের নিকটেও 'ধর্ম্ম' নামটির গুরুত্ব অসীম। শৈবনাথপন্থীগণের বিশ্বাস মতে,—'অনাদ্য-ধর্ম্ম' সৃষ্টির মূল।[১৩] ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেছেন। আদি দেবতা ধর্ম্মের নামানুসারে হয়তো কোন একটি সাধনক্ষেত্র নির্ম্মিত হয়েছিল। সুতরাং 'ধর্ম্মনগর' নামকরণের পিছনে শৈবনাথপন্থীগণের প্রভাব থাকা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। সমন্বয়ধর্ম্মী বিশ্লেষণে আরও এক পদ অগ্রসর হয়ে বলা যেতে পারে, হিন্দু-তন্ত্রাশ্রিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ এবং অনাদ্য-ধর্ম্ম দেবতায় বিশ্বাসী কাপালিক শৈবনাথপন্থী

[১৩] Obscure Religious Cult.

সম্প্রদায়েব উভয়েই ধর্ম্মকে সর্ব্বসাধনার মূল বলে যখন স্বীকার করেছেন, তখন উভয় ধর্ম্মীয় সাধকদের সম্মিলিত আগ্রহে এই অঞ্চলের সাধনপীঠের নাম ধর্ম্মনগর রাখা হয়েছিল—এ কথা মেনে নিতে দ্বিধা বা বিস্ময়ের কোন অবকাশ থাকে না। কৈলা-সহর এবং ধর্ম্মনগর নাম দুটির পশ্চাতে শৈবনাথ ধর্ম্মের সংযোগ আছে বলেই বিশ্বাস হয়। উনকোটি শৃঙ্গের দুই পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য জনপদের সঙ্গে শৈবনাথপন্থীর সংযোগ বর্ত্তমান থাকলে উনকোটির দেবাসনও নিশ্চিতভাবে নাথপন্থীগণেরই সাধনপীঠ ছিল—এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যেতে পাবে।

উনকোটির চতুষ্পার্শ্বের বিস্তৃত ভূ-ভাগে (পার্ব্বত্য শৃঙ্গে) শৈব ও বৌদ্ধ প্রভাবিত (শৈবনাথপন্থা) স্থানেব প্রাচুর্য্য অস্বীকার করাব যোগ্য নয়। বস্তুতঃ প্রাথমিক ভাবে এতদঞ্চলে অনেকগুলি শৈবস্থান গড়ে উঠেছিল। উনকোটির নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগুলির বিভিন্ন শৃঙ্গে 'ভুবনেশ্বব তীর্থ, তুঙ্গেশ্বব শিবতীর্থ প্রভৃতি শৈবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবাদ আছে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বিখ্যাত কালাপাহাড় এই দুটি তীর্থের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন। এই সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় খুবই কঠিন—কারণ কালাপাহাড়েব ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণ বিশেষ নেই। সে যাই হোক, এতদঞ্চলে শৈবক্ষেত্র বহু প্রাচীন কালের ঐতিহ্য বহন করে সন্দেহ নেই। উনকোটি থেকে অল্প দূরত্বের ব্যবধানে আসামের কপিলাশ্রম ক্ষেত্রে 'সিদ্ধেশ্বর শিবের থান' (স্থান) অদ্যাবধি বর্ত্তমান। উনকোটির প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হয়েছে বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিতে তার নামোল্লেখ রয়েছে বলে। উনকোটিব বিশেষ নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে এই ক্ষেত্রকে মধ্যস্থলে রেখে দুই

পাশ দিয়ে বরাক (বরচক্র) নদ ও মনু নদী প্রবাহিত। 'উনকোটি তীর্থ মাহাত্ম্য' নামক হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিতে বলা হয়েছে—

বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদ সম্ভূতো বরবক্র সুপুন্যদঃ
দক্ষিণস্যাং নদস্যাস্য পুণ্যা মনুনদীস্মৃতা ॥
অনয়োরন্তরা রাজন্ উনকোটিগিরির্মহান্
যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলোমুনিঃ ॥
তত্র বৈ কপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্
লিঙ্গঞ্চ কপিলং তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদং নৃণাম্ ॥[১৪]

শৈবতীর্থ রূপে উনকোটির প্রাচীন স্বীকৃতি অবশ্যই ছিল। বায়ুপুরাণে বরবক্র (বরাক) নদের তীরে কপিল মুনি 'সিদ্ধেশ্বরের' উদ্দেশ্যে তপস্যা করেন এবং এই স্থানের নাম 'কপিল তীর্থ' রূপে খ্যাত হয়, এইরূপ উল্লেখ বায়ুপুরাণে রয়েছে—

যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ
যত্র বৈ কপিলতীর্থং তত্র সিদ্ধেশ্বরো হরিঃ ॥[১৫]

শৈবতীর্থক্ষেত্র রূপেও উনকোটির অস্তিত্ব স্বতঃই প্রমাণিত। কালক্রমে বৌদ্ধ সহজিয়াগণের প্রবেশের ফলেই তান্ত্রিক শৈবনাথ

[১৪] রাজমালা—দ্বিতীয় লহর, পৃষ্ঠা—১০৭-১১৫ :
"উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা জানা যায়, বিন্ধ্যশৈলের পাদদেশোৎপন্ন পুণ্যপ্রদ বরবক্র (বরাক) নদের দক্ষিণে পুণ্য সলিলা মনুনদী প্রবাহিত হইতেছে। এই বরবক্র ও মনুনদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে উনকোটি পর্ব্বত অবস্থিত। পূর্ব্বে মহর্ষি কপিল উক্ত পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন...।"

[১৫] রাজমালা—দ্বিতীয় লহর, পৃষ্ঠা—১০৬-১১৫।

সম্প্রদায়ের উভয়েই ধর্ম্মকে সর্ব্বসাধনার মূল বলে যখন স্বীকার করেছেন, তখন উভয় ধর্ম্মীয় সাধকদের সম্মিলিত আগ্রহে এই অঞ্চলের সাধনপীঠের নাম ধর্ম্মনগর রাখা হয়েছিল—এ কথা মেনে নিতে দ্বিধা বা বিস্ময়ের কোন অবকাশ থাকে না। কৈলা-সহর এবং ধর্ম্মনগর নাম দুটির পশ্চাতে শৈবনাথ ধর্ম্মের সংযোগ আছে বলেই বিশ্বাস হয়। উনকোটি শৃঙ্গের দুই পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য জনপদের সঙ্গে শৈবনাথপন্থীর সংযোগ বর্ত্তমান থাকলে উনকোটির দেবাসনও নিশ্চিতভাবে নাথপন্থীগণেরই সাধনপীঠ ছিল—এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যেতে পারে।

উনকোটির চতুষ্পার্শ্বের বিস্তৃত ভূ-ভাগে (পার্ব্বত্য শৃঙ্গে) শৈব ও বৌদ্ধ প্রভাবিত (শৈবনাথপন্থা) স্থানের প্রাচুর্য্য অস্বীকার করার যোগ্য নয়। বস্তুতঃ প্রাথমিক ভাবে এতদঞ্চলে অনেকগুলি শৈবস্থান গড়ে উঠেছিল। উনকোটির নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগুলির বিভিন্ন শৃঙ্গে ভুবনেশ্বর তীর্থ, তুঙ্গেশ্বর শিবতীর্থ প্রভৃতি শৈবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবাদ আছে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বিখ্যাত কালাপাহাড় এই দুটি তীর্থের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন। এই সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় খুবই কঠিন—কারণ কালাপাহাড়ের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণ বিশেষ নেই। সে যাই হোক, এতদঞ্চলে শৈবক্ষেত্র বহু প্রাচীন কালের ঐতিহ্য বহন করে সন্দেহ নেই। উনকোটি থেকে অল্প দূরত্বের ব্যবধানে আসামের কপিলাশ্রম ক্ষেত্রে 'সিদ্ধেশ্বর শিবের থান' (স্থান) অদ্যাবধি বর্ত্তমান। উনকোটির প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হয়েছে বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিতে তার নামোল্লেখ রয়েছে বলে। উনকোটির বিশেষ নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে এই ক্ষেত্রকে মধ্যস্থলে রেখে দুই

পাশ দিয়ে বরাক (বরচক্র) নদ ও মনু নদী প্রবাহিত। 'উনকোটি তীর্থ মাহাত্ম্য' নামক হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিতে বলা হয়েছে—

বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদ সম্ভূতো বরবক্র সুপুন্যদঃ
দক্ষিণস্যাং নদস্যাস্য পুণ্যা মনুনদীস্মৃতা ॥
অনয়োরন্তরা রাজন্ উনকোটিগিরির্মহান্
যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলোমুনিঃ ॥
তত্র বৈ কপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্
লিঙ্গঞ্চ কপিলং তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদং নৃণাম্ ॥[১৪]

শৈবতীর্থ রূপে উনকোটির প্রাচীন স্বীকৃতি অবশ্যই ছিল। বায়ুপুরাণে বরবক্র (বরাক) নদের তীরে কপিল মুনি 'সিদ্ধেশ্বরের' উদ্দেশ্যে তপস্যা করেন এবং এই স্থানের নাম 'কপিল তীর্থ' রূপে খ্যাত হয়, এইরূপ উল্লেখ বায়ুপুরাণে রয়েছে—

যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ
যত্র বৈ কপিলতীর্থং তত্র সিদ্ধেশ্বরো হরিঃ ॥[১৫]

শৈবতীর্থক্ষেত্র রূপেও উনকোটির অস্তিত্ব স্বতঃই প্রমাণিত। কালক্রমে বৌদ্ধ সহজিয়াগণের প্রবেশের ফলেই তান্ত্রিক শৈবনাথ

[১৪] রাজমালা—দ্বিতীয় লহর, পৃষ্ঠা—১০৭-১১৫ :
"উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা জানা যায়, বিন্ধ্যশৈলের পাদদেশোৎপন্ন পুণ্যপ্রদ বরবক্র (বরাক) নদের দক্ষিণে পুণ্য সলিলা মনুনদী প্রবাহিত হইতেছে। এই বরবক্র ও মনুনদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে উনকোটি পর্ব্বত অবস্থিত। পূর্ব্বে মহর্ষি কপিল উক্ত পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন...।"

[১৫] রাজমালা—দ্বিতীয় লহর, পৃষ্ঠা—১০৬-১১৫।

পন্থার উদ্ভব হয়। পুরাণগুলিতে উনকোটি নামের উল্লেখ নেই বটে —কিন্তু শৈবক্ষেত্র রূপে এর অবস্থিতি ছিল—এরূপ অনুমান করা চলে। অর্ব্বাচীন-কালে রচিত তন্ত্রগ্রন্থে উনকোটির নামোল্লেখ দেখা যায়। সেই কারণে একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনকে সংশয়াকুল করে তোলে, এই শৈবক্ষেত্রে বৌদ্ধ প্রভাব ও মিশ্রণ সম্পাদিত হওয়ার পর এই ক্ষেত্রের যথার্থ নাম কি ছিল? উনকোটির নাম সত্যসত্যই উনকোটি ছিল কি?

আবৃত-ইতিহাসের পটোত্তলনে একদিন হয়তো নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হবে—উনকোটির নাম বাস্তব পক্ষে ছিল 'শূন্যকূট'। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই শব্দটির ক্রমিক বিবর্ত্তন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শূন্যকূট শব্দটি অপভ্রষ্ট হয়ে ক্রমে সুন্‌কূট > সুনকূট-এ রূপান্তরিত হয়েছে। পার্ব্বত্য ভাষা এবং অসমীয়া ভাষার প্রভাবে আঞ্চলিক 'শ' 'স' বর্ণের উচ্চারণ-বিকৃতি হেতু 'হ' বর্ণের আগমন সুপ্রচলিত। যেমন—সে > হে, সকল > হকল, সত্য > হইত্য, সহস্র> হহস্র, ইত্যাদি ভুরিপ্রমাণ নিদর্শন দেখা যেতে পারে। 'শ' 'স' বর্ণের 'হ'-কারান্ত উচ্চারণের সূত্র অবলম্বন করে এই শূন্যকূট শব্দের আদিবর্ণ 'হ'-কার রূপান্তব গ্রহণ করা অসম্ভব নয়। সুতরাং ক্রমিক বিবর্ত্তনরীতি অনুসারে এই শব্দটির বিবর্ত্তন যথাক্রমে শূন্যকূট > [সুন্নকূট] > সুনকূট> হুনকূট>উনকূট শব্দরূপে প্রচলিত হয়েছে। পরে জিহ্বার জড়তা অথবা উচ্চারণ বিকৃতিহেতু উনকূট শব্দই কোথাও 'উন্‌কূট'> কোথাও বা 'উনকোটি'তে পরিবর্ত্তিত হয়ে উভয় উচ্চারণের প্রচলনের অস্তিত্ব রক্ষা করছে। 'হ' বর্ণের মহাপ্রাণতা লোপ হয়ে অল্পপ্রাণতা লাভ ভাষাতাত্ত্বিক নিয়ম বহির্ভূত নয়। অতএব

নামপ্রসঙ্গে এই বিশ্লেষণের যাথার্থ্য দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করা সমীচীন বলে বিবেচনা করা চলে।

উনকোটি যদি সত্যই 'শূন্যকূট' নামে একদা খ্যাত হয়ে থাকে, তাহলে আঞ্চলিক ধর্ম্মনৈতিক সম্বন্ধসূত্রে এই নামকরণের যথার্থ সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, 'কূট' শব্দের অর্থ শিখর বা শৃঙ্গ।[১৬] পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি সেই কারণেই 'কূট' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। রামায়ণে উল্লেখিত 'চিত্রকূট' নামের সঙ্গে পরিচয় নেই—এমন হিন্দু বিরল। উত্তরবঙ্গের 'দেবীকূট বিহার', রাঢ়বঙ্গের 'ত্রিকূটক বিহার'—নাথপন্থীগণেরই সাধনাস্থল ছিল। গোরক্ষপুরে 'গোরক্ষটিলা' কুমিল্লার 'ময়নামতীর টিলা'—পর্ব্বতোপরি স্থাপিত শৈবনাথপন্থীগণের সাধনক্ষেত্রের পরিচয় বহন করছে। সুতরাং আলোচ্য সাধনক্ষেত্রের নাম 'শূন্যকূট বিহার' হওয়াই সঙ্গত। বিশেষতঃ বৌদ্ধপ্রভাবিত সহজ সাধন-পদ্ধতি যখন এখানে সুপ্রচলিত হতে দেখা গেছে—তখন সংশয়ের হেতু সামান্যই। শূন্যকূট নামের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণের দ্বারা এবং এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও সহজ-সাধনের প্রসার লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাশূন্য হওয়া যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ছাড়াও সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে, 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' কেবল ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি। সাম্প্রদায়িকতার গরল যুগ-পরিব্যাপ্ত হয়ে মানবসভ্যতাকে বিষাক্ত করে চলেছে। দূর অতীতের পাশ্চাত্য দেশগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—আসীরীয় সভ্যতার

[১৬] বাঙালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃষ্ঠা ৬৪৯

সঙ্গে গ্রীক জাতির সংগ্রাম, মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার লড়াই, এবং মধ্যযুগের ইয়োরোপে বহুখ্যাত ক্রুসেড্‌স্‌ (Crusades) মূলতঃ রাজ্যলাভের সংগ্রামই শুধু নয়—'ধর্ম্মোন্মাদনা' তার প্রাথমিক ভিত্তি। যুগে-যুগে, কালে-কালে 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়' পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণু জাতিগুলি অগণিত সংখ্যায় প্রাণ দিয়েছে কেবল নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে।

ধর্ম্মোন্মাদনার সেই প্রবল দাঙ্গায়, গৌড়বঙ্গ থেকে উৎপাটিত আশ্রয়প্রার্থী (Refugee) বৌদ্ধদের মহাক্ষেত্র নির্ম্মিত হয়েছিল ত্রিপুরা এবং শ্রীহট্ট-কাছাড়েব পার্ব্বত্য অঞ্চলে। তাব প্রমাণ স্বরূপ বহু নিদর্শন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ত্রিপুবা জেলার এক স্থান থেকে পাওয়া গেছে বুদ্ধের খসর্পন-লোকনাথ মূর্ত্তি। অবলোকিতেশ্বরের স্থিরচক্র মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি পাওয়া গেছে ত্রিপুবাব শুভপুর অঞ্চলে। (ত্রিপুরা জেলার) বড় কামতায় মুণ্ডমালা-পরিহিত হেরুক-বজ্র মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হযেছে। কাছাড় জেলাব সন্নিকটে ত্রিপুরায় অবস্থিত ধর্ম্মনগর অঞ্চলে পাওযা গেছে শক্তি-বিরহিত হেবজ্র মূর্ত্তি এবং অষ্টভুজা সিততাবার মূর্ত্তি। উনকোটিব হর-পার্ব্বতী মূর্ত্তি আসলে শক্তির দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হেবজ্র-মূর্ত্তিব প্রয়োজন সিদ্ধ কবত কিনা—কে জানে।[১৭]

কেবলমাত্র মূর্ত্তির আবিষ্কারেই আঞ্চলিক ধর্ম্মের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তাই নয়। ত্রিপুরা রাজবংশের কতিপয় নৃপতি-বংশপরম্পরায় শৈবপন্থী এবং সহজিয়াপন্থী ছিলেন—ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে। শৈবপন্থা ও সহজপন্থার সমন্বয়জাত শৈবপন্থার কথা এই কারণেই মনে উদিত হয়। নাথযোগিগণ নিজ নামের সঙ্গে 'পা' অথবা

[১৭] বাঙালীর ইতিহাস—পৃষ্ঠা ৬৪৭

'ফা' শব্দ ব্যবহার করতেন। 'পা' অথবা 'ফা' শব্দের অর্থ— পিতা, প্রভু অথবা গুরু। ত্রিপুরার রাজগণের অনেকের নামের সঙ্গেই এই দুই বর্ণ যুক্ত আছে। মহারাজ আদিধর্ম্ম-পা, খারুংফা, সুধর্ম্মপা প্রভৃতি প্রাচীন রাজন্যবর্গের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[১৮] সহজপন্থীনাথ এবং শৈবনাথগণের উভয় সম্প্রদায়ের একই গুরুর নামের সঙ্গেও 'পা' এবং 'ফা' শব্দের সংযোজনা আছে, যেমন—কাহ্নপা, শবরপা, হাড়িফা প্রভৃতি।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে প্রদত্ত একটি তথ্যের প্রতি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাবে, "বর্ত্তমান কৈলাসহরের চারি মাইল উত্তরে প্রাচীন রাজবাটি ছিল। সেইস্থান এখন জঙ্গলাকীর্ণ। ত্রৈপুর রাজগণ শ্রীহট্ট সীমা হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়াছেন।" নবম-দশম খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর কোন এক সময়ে ঘটনাটি হয়তো সংঘটিত হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করা গেছে যে, দশম-একাদশ শতাব্দীতে শৈবনাথ-সিদ্ধাই রাণী ময়নামতী এবং তদীয় পুত্র চন্দ্রবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র (গোপীচন্দ্র) ত্রিপুর-রাজরূপে ইতিহাসে বর্ণিত। তিনি স্বয়ং শৈবনাথ ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও সিদ্ধাই হাড়িপার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।[১৯] শৈবনাথপন্থার প্রসার এই রাজন্যবর্গ এবং বিশেষতঃ গোপীচন্দ্রের সহায়তার ফল—একথা নির্ভরযোগ্য বলেই মনে হয়।

কৈলাসহর এবং ধর্ম্মনগর-এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত উনকোটি ক্ষেত্রকে শৈব এবং সহজিয়া বৌদ্ধ প্রভাবিত শৈবনাথপন্থার সাধন-পীঠরূপে মনে করার পিছনে বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য যথেষ্ট

---

[১৮] শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে প্রদত্ত বংশমালা।

[১৯] বাঙালীর ইতিহাস—পৃষ্ঠা ৪৮৩; এবং
Obscure Religious Cults—পৃষ্ঠা ৩৭৬

কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। উনকোটির নাম যে সত্য-সত্যই শূন্যকূট ছিল, একথা বিশ্বাস করার মতো শক্তিশালী আরো একটি যুক্তি অথবা কারণ প্রদর্শন করা যেতে পারে। সহজিয়া বৌদ্ধ অথবা শৈবনাথ তান্ত্রিকগণ ললনা-রসনা-অবধূতিকা-মার্গে হঠযৌগিক এবং তান্ত্রিক কায়াসাধন প্রণালীর দ্বারা শূন্যতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেছেন। তাঁদের মতে—"সুন্ন নিরঞ্জন পরম মহাসুহ

তহি পুন ন পাব।"

অর্থাৎ, শূন্য নিরঞ্জনই পরম মহাসুখ ; সেখানে পুণ্য নেই, পাপও নেই। এই বিচিত্র নৈবাকার মাধ্যমে 'নেতিত্ব' সাধনা নৈরাত্মা-লাভের জন্য। সহজিয়া বৌদ্ধগণ এই সাধনায় মগ্ন ছিলেন। শৈবনাথ-পন্থী কায়াসাধকগণ আদিধর্ম্ম শূন্য নিরঞ্জনকে লাভ কবে পুনর্জন্ম রোধ করতে চেয়েছিলেন। শৈবনাথ ধর্ম্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লুইপাদ মৎস্যেন্দ্রনাথ যেমন সহজিয়া বৌদ্ধগণের সিদ্ধাচার্য্য (মীননাথ নামেও এঁর পরিচয় সমান বিখ্যাত) ছিলেন, তেমনি সহজসাধক শৈবনাথ-গণেরও তিনি আদিগুরু। শূন্যতামার্গে এই সহজ-সিদ্ধির প্রবর্ত্তন তিনিই করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর কাল পরিচয়—রামপালদেবের রাজত্বকালের সমকালীন।

সহজ-সিদ্ধির পরমতম লক্ষ্য শূন্যতা প্রাপ্তি। শূন্যতামার্গের সাধন-পীঠস্থান যে পর্ব্বতশৃঙ্গে স্থাপিত, তাকে 'শূন্যকূট' নামে অভিহিত করাই তো সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্গত। কালক্রমে মৌখিক ভাষার বিকৃতি-হেতু, উচ্চারণ পরিবর্ত্তনের ফলে, এর যথার্থ পরিচয়কে আবৃত করেছে মাত্র। উৎসাহী অনুসন্ধানীর শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টায় হয়তো একদিন সেই আবরণ উন্মোচিত হওয়া অসম্ভব হবে না। তারপর,······একদিন আধুনিক কালের এই উনকোটির, সেই আবৃত-ইতিহাসের আবরণ

উন্মোচিত করে, নবম-দশম শতাব্দীতে যখন আমাদের অনুসন্ধিৎসা পথ-পরিক্রমা করবে,—কে বলতে পারে, তখন হয়তো শূন্যকূট পর্ব্বতের এই পীঠস্থানে ধূতাঙ্গ আচরণকারী জীর্ণ-চীবর পরিহিত নগ্নপ্রায় কতকগুলি সন্ন্যাসীর দেখা পাব। অবশিষ্ট নিদর্শন-প্রমাণ-গুলিকে অবলম্বন করে আমাদের কল্পনা তখন হয়তো শঙ্কিত বিস্ময়ে দেখবে—নগর-বহির্ভূত অরণ্য-সংকুল পর্ব্বতে উন্মুক্ত প্রকৃতির আশ্রয়ে শৈবনাথপন্থী তন্ত্রযোগী কাপালিকগণ এই শূন্যকূট বিহারে গভীর নিষ্ঠায় শূন্যতা-সাধনের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে চলেছেন—মৃত্যুঞ্জয়ী হবার সাধনায়॥

কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। উনকোটির নাম যে সত্য-সত্যই শূন্যকূট ছিল, একথা বিশ্বাস করার মতো শক্তিশালী আবো একটি যুক্তি অথবা কারণ প্রদর্শন করা যেতে পারে। সহজিয়া বৌদ্ধ অথবা শৈবনাথ তান্ত্রিকগণ ললনা-রসনা-অবধূতিকা-মার্গে হঠযৌগিক এবং তান্ত্রিক কায়াসাধন প্রণালীর দ্বারা শূন্যতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেছেন। তাঁদের মতে—"সুন্‌ন নিরঞ্জন পরম মহাসুহ

তহি পুন ন পাব।"

অর্থাৎ, শূন্য নিরঞ্জনই পরম মহাসুখ; সেখানে পুণ্য নেই, পাপও নেই। এই বিচিত্র নৈবাকার মাধ্যমে 'নেতিত্ব' সাধনা নৈরাত্মা-লাভের জন্য। সহজিয়া বৌদ্ধগণ এই সাধনায় মগ্ন ছিলেন। শৈবনাথ-পন্থী কায়াসাধকগণ আদিধর্ম্ম শূন্য নিরঞ্জনকে লাভ করে পুনর্জন্ম রোধ করতে চেয়েছিলেন। শৈবনাথ ধর্ম্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লুইপাদ মৎস্যেন্দ্রনাথ যেমন সহজিয়া বৌদ্ধগণের সিদ্ধাচার্য্য (মীননাথ নামেও এঁর পরিচয় সমান বিখ্যাত) ছিলেন, তেমনি সহজসাধক শৈবনাথ-গণেরও তিনি আদিগুরু। শূন্যতামার্গে এই সহজ-সিদ্ধির প্রবর্ত্তন তিনিই করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর কাল-পরিচয়—রামপালদেবের রাজত্বকালের সমকালীন।

সহজ-সিদ্ধির পরমতম লক্ষ্য শূন্যতা প্রাপ্তি। শূন্যতামার্গের সাধন-পীঠস্থান যে পর্ব্বতশৃঙ্গে স্থাপিত, তাকে 'শূন্যকূট' নামে অভিহিত করাই তো সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্গত। কালক্রমে মৌখিক ভাষার বিকৃতি-হেতু, উচ্চারণ পরিবর্ত্তনের ফলে, এর যথার্থ পরিচয়কে আবৃত করেছে মাত্র। উৎসাহী অনুসন্ধানীর শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টায় হয়তো একদিন সেই আবরণ উন্মোচিত হওয়া অসম্ভব হবে না। তারপর,......একদিন আধুনিক কালের এই উনকোটির, সেই আবৃত-ইতিহাসের আবরণ

উন্মোচিত করে, নবম-দশম শতাব্দীতে যখন আমাদের অনুসন্ধিৎসা পথ-পরিক্রমা করবে,—কে বলতে পারে, তখন হয়তো শূন্যকূট পর্ব্বতের এই পীঠস্থানে ধূতাঙ্গ আচরণকারী জীর্ণ-চীবর পরিহিত নগ্নপ্রায় কতকগুলি সন্ন্যাসীর দেখা পাব। অবশিষ্ট নিদর্শন-প্রমাণ-গুলিকে অবলম্বন করে আমাদের কল্পনা তখন হয়তো শঙ্কিত বিস্ময়ে দেখবে—নগর-বহির্ভূত অরণ্য-সংকুল পর্ব্বতে উন্মুক্ত প্রকৃতির আশ্রয়ে শৈবনাথপন্থী তন্ত্রযোগী কাপালিকগণ এই শূন্যকূট বিহারে গভীর নিষ্ঠায় শূন্যতা-সাধনের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে চলেছেন—মৃত্যুঞ্জয়ী হবার সাধনায়॥

মূর্ত্তি—নং ১, ২ ও ৩ : অঘোর রুদ্র ও শক্তি

মূর্ত্তিগুলি পর্ব্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ (Relief), আনুমানিক ২০।২৫ ফুট উচ্চ।

১ এবং ২ নং চিত্র এক মূর্ত্তিরই দুইখানি ভিন্ন চিত্র। ৩ নং চিত্র এই মূর্ত্তির বামপার্শ্বে অবস্থিত। মূর্ত্তি দুইটি শিব-পার্ব্বতী বা উমা-মহেশ্বর কিম্বা 'অঘোর ভৈরব' ও তার 'শক্তির' মূর্ত্তি বলে অনুমান হয়।

'অঘোর রুদ্র' বা 'বটুক ভৈরব' এবং তাঁর 'শক্তি'র সাধনা অঘোরপন্থী তান্ত্রিক শৈব সম্প্রদায়েব নিকট অবশ্য আরাধ্য। শৈব-নাথপন্থীগণের মধ্যেই এই অঘোরী শাখার অস্তিত্ব অদ্যাবধি রয়েছে। এঁরা সর্ব্বজীব ও সর্ব্বপদার্থ সমজ্ঞান কবেন এবং জগৎ ব্রহ্মময় অনুভব করে থাকেন। বিষ্ঠা-চন্দনের কোন ভেদ করেন না। সর্ব্বসাধারণের ঘৃণ্য মল-মূত্র এবং অর্দ্ধদগ্ধ শবদেহ ভক্ষণ করেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের (১০।১৬) "সর্ব্বোবৈ রুদ্রঃ তস্মৈ রুদ্রায় নমোহস্তু" এই উক্তিই তাঁরা একমাত্র সত্য মনে করেন।

উনকোটি তীর্থে এই দেবতার আবির্ভাব তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত। অঘোরী কাপালিকগণ কেশশ্মশ্রু ধারণ ও অস্থিমালা ব্যবহার করেন। সাধনায় অতি-কৃচ্ছ্রতা ও কঠোর নিয়মের পক্ষপাতী এবং তাঁরা 'শিব-শক্তি'র ভীষণ ভাবের মূর্ত্তি উপাসনা দ্বারা অভীষ্ট লাভের আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন। শিব ও শক্তির ভীষণ মূর্ত্তির উপাসক বলে এঁদের সাধনপন্থাও উগ্র ও ভীষণ। নরবলি দান' সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ। ভবভূতি প্রণীত 'মালতী-মাধব' নাটকে 'অঘোরী ঘন্টা চামুণ্ডার' উদ্দেশ্যে মালতীকে বলিদানের প্রয়াস করা হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে গুপ্ত যুগ ও তার অবসান কালে অর্থাৎ অন্ততঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতেও এই তন্ত্রসাধনা বঙ্গ দেশে প্রচলিত হয়েছিল। (ভারতে শক্তি সাধনা : পৃঃ ২৪৮ থেকে তথ্য সংগৃহীত)

মূর্ত্তি—নং ৪ : ত্রিশূলধৃ শিব

একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড (Boulder) খোদিত করে এই শিবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছে। মূর্ত্তিটি পূর্ণাবয়ব নয়—হস্তদ্বয়ের আভাস আছে, কিন্তু মূলতঃ হস্তদ্বয় নির্ম্মিত হয়েছিল কিনা অথবা সম্পূর্ণতঃ ভগ্ন হয়ে গেছে—তা নির্ণয়যোগ্য নয়। তবে মূর্ত্তির অধোভাগ যে নির্ম্মিত হয় নি, তা স্পষ্টতঃ বোঝা যায়। কপালে রুদ্রাক্ষ-মালা, ত্রিনয়ন, শিবের বৃহৎ কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল—অধরোষ্ঠ দৃঢ়সংলগ্ন। এই মূর্ত্তিটি অন্যান্য মূর্ত্তির ন্যায় দংষ্ট্রাকরাল নয়। দক্ষিণ স্কন্ধের উপর বৃহৎ ত্রিশূল ন্যস্ত। ত্রিশূলের নিম্নভাগ ভগ্ন।

এই মূর্ত্তিটি প্রাচীন যুগের সৃষ্টি। তবে গুপ্তযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী নয় বলেই মনে হয়। গুপ্ত যুগে কোন এক সময়ে শৈব-সাধকবর্গের দ্বারা হওয়াই সম্ভব। মূর্ত্তিটির বিশেষত্ব তার শিরোভূষণে। দুইটি গোলাকার নাতি উচ্চ অথচ সুপুষ্ট শৃঙ্গের ন্যায় বস্তু—মহেঞ্জোদারোর পশুপতিনাথের শৃঙ্গমুকুটের একটি বিবর্ত্তিত লক্ষণ বলে মনে হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, নাথধর্ম্মে শৃঙ্গধারণ (শিংনাদ) নাথ-যোগীর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। মূর্ত্তিটি প্রায় দুই মানুষ সমান উচ্চ।

মূর্ত্তি—নং ৫ ও ৬ : অর্দ্ধনারীশ্বর

এক মূর্ত্তিরই দুটি ভিন্ন চিত্র। এই মূর্ত্তিকে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বলে অনুমান হয়। মূর্ত্তিটি উৎকীর্ণ-কলার (Relief) আরও একটি নিদর্শন ; পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়ে থাকতে পারে। মুণ্ডাকৃতি এই মূর্ত্তির দক্ষিণ ওষ্ঠাংশের উর্দ্ধভাগে সুপুষ্ট গুম্ফ রেখা বর্ত্তমান—কিন্তু বাম অংশ গুম্ফরেখা-চিহ্নহীন। তন্ত্র বা আগম শাস্ত্রে বলা হয়েছে—'অ' এবং 'আ' এই দুইয়ের মিলনেই 'ই' প্রকাশিত হয়। 'অ' অর্থে চিৎশক্তি একা বিরাজ করেন, 'আ' অর্থে এক থেকে দ্বৈতরূপ ধারণ ; দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখার মতো যুগলরূপ বা যুগনদ্ধরূপ বা আনন্দভাব। সেইরূপ 'অ' এবং 'আ'র মিলনেই 'ই' বা ইচ্ছা

শক্তির বিকাশ, আনন্দের ভাব থেকে সৃষ্টি। তন্ত্র একে বলেছেন মহাশক্তি। নববৌদ্ধধর্ম্মে এরই নাম প্রজ্ঞাপারমিতা।

নাথ সম্প্রদায়ের 'সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি' এবং 'অমরৌঘশাসনে' (গোরক্ষনাথ বিরচিত) এই তত্ত্ব স্বীকৃত। 'শিব-শক্তি'র সঙ্গে 'ইচ্ছা বা চিৎ'-এর মিলনেই 'মহাসুখ বা এবম্‌কার'—বৌদ্ধগণও এই কথা মেনে নিয়েছেন। 'শিব ও শক্তি' এই উভয়েবই প্রতিবিম্ব একীভূত হয়ে পরাপ্রাসাদ বিদ্যা হয়। একেই বলা হয়েছে 'অৰ্দ্ধনাবীশ্বব রূপ'। এই মূৰ্ত্তিকে তাই অৰ্দ্ধনারীশ্বর বলেই মনে হয়। (না. স. ই.—পৃষ্ঠা ৫০৪)

মূৰ্ত্তিটির বিশালতা সহজেই নিরূপণ কবা যায় এই মূৰ্ত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের সঙ্গে তুলনার দ্বারা।

মূর্ত্তি—নং ৭ : বজ্রানঙ্গ মঞ্জুশ্রী

'বৌদ্ধদের দেবদেবী' গ্রন্থে (৩৬ পৃষ্ঠায) বলা হযেছে বৌদ্ধধর্ম্মে "যত বোধিসত্ত্ব আছে তাহার মধ্যে মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বর-ই প্রধান।" 'সাধনমালা'য় মঞ্জুশ্রীর নানা রূপ ধ্যান ও রূপ কল্পনা পাওয়া যায়। বজ্রানঙ্গ মূৰ্ত্তি তার মধ্যে অন্যতম।

বজ্রানঙ্গ মঞ্জুশ্রী মূৰ্ত্তি একমুখ এবং ষড়্‌ভুজ। গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ এবং ষোড়শ বর্ষাকৃতি। "তিনি প্রত্যালীঢ পদে দণ্ডায়মান থাকেন—এবং তাঁহার মুখে ও ভাবে শৃংগাররস প্রকটিত হয়। মুখ্যভুজদ্বয়ে তিনি ফুলের ধনুতে লালপদ্মের বাণ জুড়িয়া আকর্ণ আকর্ষণ করেন। অপর দক্ষিণ ভুজদ্বয়ে অসি এবং দর্পন এবং অপর বামভুজদ্বয়ে পদ্ম এবং অশোক ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার জটামুকুটের উপর একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্য মূৰ্ত্তি পরিদৃশ্যমান হয়।" (বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃ: ৩৬)

এই মূৰ্ত্তির আকৃতি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ও শাক্ত ধৰ্ম্মমতের সংমিশ্রণ জাত বিবৰ্ত্তিত রূপ। মূৰ্ত্তিটি একমুখ ও দ্বিভুজ। বজ্রানঙ্গ মঞ্জুশ্রী মূৰ্ত্তির সহিত তার বহু প্রকারের সাদৃশ্য। এর মুখে ও ভাবে শৃংগাররস প্রকটিত এবং

আকৃতিতে ষোড়শ বর্ষাকৃতি যৌবন-লাবণ্য। জটামুকুট ও কণ্ঠে কুণ্ডল পরিহিত এই মূর্ত্তি প্রত্যালীঢ় পদে দণ্ডায়মান থেকে, ধনুতে ফুলের বাণ সংযোজন করে, আকর্ণ আকর্ষণ করে থাকা ভঙ্গী এখানে সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ-শৈব ধর্ম্ম সমন্বয়ে বিবর্ত্তিত কোন রূপ-কল্পনার পরিচয় বহন করলেও, বজ্রানঙ্গ মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্য-বাহী এই মূর্ত্তি।

মূর্ত্তি—নং ৮

পর্ব্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ মূর্ত্তিটি আনুমানিক পাঁচফুট দীর্ঘ। কপাট সদৃশ বৃহৎ কর্ণদ্বয়ে চক্রাকৃতি কুণ্ডল। মাথায় জটার উপর রত্নমুকুট, দুই পার্শ্বে প্রলম্বিত জটাজাল কুঞ্চিত হয়ে কুণ্ডলাকৃতি ধারণ করেছে প্রান্ত ভাগে। ব্যাদিত-দংষ্ট্রা হওয়া সত্ত্বেও ভীষণ দর্শন নয—পক্ষান্তবে প্রসন্ন হাস্যোদ্ভাসিত মুখাবয়ব। মূল্যবান পরিচ্ছদ ও কণ্ঠে মণিমালিকা পবিহিতা মূর্ত্তিটি নাবী মূর্ত্তি বলেই অনুমিত হয়।

অনেকে এটিকে গঙ্গামূর্ত্তি বলে মনে করেন। 'বাজমালা' গ্রন্থেও গঙ্গাবতরণের কথা বলা হয়েছে। মূর্ত্তিটি অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির দক্ষিণভাগে কিছুটা উপরের পর্ব্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ। এর সঠিক পরিচয় নির্ণয় করা কঠিন। এই মূর্ত্তিটির দক্ষিণ পার্শ্বে 'বজ্রানঙ্গ মঞ্জুশ্রী'র মূর্ত্তি অবস্থিত।

মূর্ত্তি—নং ৯ : নৈরাত্মা

মূর্ত্তিটি নৈরাত্মাদেবীর মূর্ত্তি বলেই মনে হয়। বৌদ্ধ সহজিয়া তন্ত্রমার্গে নৈরাত্মার একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। বৌদ্ধদের দেবদেবী গ্রন্থে (পৃঃ ৬৯-৭০) বলা হয়েছে,—"যাহার আত্মা নাই, তিনিই নৈরাত্মা। বলা বাহুল্য, নৈরাত্মা জগৎকারণ নিঃস্বভাব স্বভাবশুদ্ধ পরাশূন্যের একটি গুণ। ...ইঁহার বর্ণ নীল, একটি মুখ, এবং দুইটি হাত। ইনি দেখিতে অতি ভীষণ। অগ্নিজ্বালার ন্যায় কেশরাজি। গলায় মুণ্ডমালা এবং ক্রোধোদ্ভাসিত

মুখমণ্ডল…। ইনি শবোপরি অর্দ্ধপর্য্যঙ্কাসনে নৃত্য করিতে থাকেন। তাঁহাব দক্ষিণহস্তে কর্ত্রি এবং বামে হৃৎপ্রদেশে রক্তপূর্ণ কপাল থাকে। একটী খট্বাঙ্গ তাঁহার বামস্কন্ধ হইতে ঝুলিতে থাকে। নৈরাত্মাকে হেরুকের শক্তিরূপে সময়ে সময়ে কল্পনা করা হয়।"…

আলোচ্য মূর্ত্তিটিতে উল্লেখিত বর্ণনার ক্ষেত্রে দু-একটি ব্যতিক্রম আছে। উপরি-উক্ত নৈরাত্মার বর্ণনা অনুযায়ী—আলোচ্য মূর্ত্তিতেও একটি মুখ দুইটি হাত। ইনি ভীষণ-দর্শনা, কেশরাজি ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান। গলায় মালা (মুণ্ড অথবা রুদ্রাক্ষ), ক্রোধোদ্ভাসিত ব্যাদিত-দংষ্ট্রা ভীতিপ্রদ। তবে পদতলে শব-এর অস্তিত্বহীন, পরিবর্ত্তে খট্বাঙ্গের (খাট=Bedstead) উপরে অর্দ্ধপর্য্যঙ্কাসনে (বীরাসনে) নৃত্যরতা। দক্ষিণহস্ত কর্ত্রি ধারণ না-করে, দক্ষিণ কটিদেশে ন্যস্ত, বামহস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত। বামহস্তে রক্তপূর্ণ কপাল ধারণ করেন নাই সত্য, কিন্তু বামহস্তের নিকটে একটি নর-কপাল (নরমুণ্ড) বর্ত্তমান। মুণ্ডটি ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পৌঁছেছে। এই মুণ্ডের কর্ণদ্বয়ও বৃহৎ এবং কুণ্ডল পরিহিত। যদিও বামস্কন্ধ খট্বাঙ্গ (মুদ্গর) শূন্য, কিন্তু এই মূর্ত্তির নিম্নে একটি সুবৃহৎ খট্বাঙ্গ বা মুদ্গর পড়ে থাকতে দেখা যায় (চিত্র নং ১১ লক্ষণীয়)।

তন্ত্রসাধন ক্ষেত্রে শিব ও শক্তির অবস্থান যেমন অনিবার্য্য, সেইরূপ বৌদ্ধ-শৈব সমন্বিত নাথ ধর্ম্মক্ষেত্রে হেরুকের শক্তি রূপে কল্পিত নৈরাত্মার একটি বিবর্ত্তিত রূপকল্পনা বলেই এই মূর্ত্তিটিকে মনে করা যেতে পারে। কেননা, "নাথমার্গে প্রজ্ঞা, নৈরাত্মাদেবী, মহাভাব প্রভৃতির কোন প্রকার উল্লেখ নাই।" কিন্তু বিবর্ত্তন-ধর্ম্মী উনকোটিতে শৈব-বৌদ্ধ সমন্বয়জাত তন্ত্রগত কোন রূপকল্পনা বলেই এটিকে মনে করা যেতে পারে। প্রাচীন ও পার্ব্বত্য জাতির অন্তর্গত fertility cult-এর ক্ষীণ নিদর্শন, কালক্রমে তন্ত্র শাখায় যে প্রবিষ্ট হয় নি—এ কথাও জোর করে বলা যায় না।

মূর্ত্তি—নং ১০ : মহাবন্ধ

মূর্ত্তিটি যৌগিক আসনের পরিচয় জ্ঞাপক। তান্ত্রিক সাধন মতে 'মহামুদ্রা', 'মহাবন্ধ' ও 'মহাবেধ' নামক মুদ্রার অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে হয়। তান্ত্রিক সাধন-মার্গে মুদ্রার যে পরিচয় পাওয়া যায়-তদনুসারে এই মূর্ত্তিটিকে মহাবন্ধ ও মহাবেধ মুদ্রার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

তিব্বতীয় লাসা বা তান্ত্রিকগণ মহামুদ্রা সাধন নির্ব্বাণলাভের একমাত্র উপায় রূপে গণ্য করতেন। "ঘেরণ্ডসংহিতায় বর্ণিত আছে—বামপদ নিম্নে ও দক্ষিণপদ প্রসারিত করার পর উপবেশন করে, দুই হাতের তর্জ্জনী ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গুলির সাহায্যে, প্রসারিত পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণান্তর জালন্ধর বন্ধ যোগে কণ্ঠপ্রদেশে বায়ুরুদ্ধ করে, সুষুম্নায় বায়ুধারণ করার নাম 'মহামুদ্রা'। (না. স. ই—পৃ: ৪২৭)

'মহামুদ্রা' সাধনের অব্যবহিত পরেই 'মহাবন্ধ ও মহাবেধ' সাধন প্রয়োজন। মহাবন্ধ মুদ্রায়—"বামগুল্ফ দ্বারা পায়ুমূল নিরোধ করিয়া, দক্ষিণপদ দ্বারা সযত্নে বামগুল্ফ আপীড়ন পূর্ব্বক জালন্ধর বন্ধ করিয়া, বায়ুপূরণ করিয়া যোণিতে আকর্ষণ বা মূলবন্ধ করিয়া, মধ্যনাড়ীতে মনঃসংযোগ করাকে 'মহাবন্ধ' বলে। মূর্ত্তিটির মুদ্রাভঙ্গীর সঙ্গে এই নির্দ্দেশের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

'মহাবেধ' মুদ্রায়,—'মহাবন্ধে অবস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে উভয় নাসাপুটে বায়ুগ্রহণ করিয়া করতলদ্বয় সাহায্যে কটিদেশে মন্দ মন্দ আঘাত করিলে সুষুম্না মধ্যে বায়ু প্রবাহিত হইবে, ইহার নাম মহাবেধ। মহাবেধ বিনা মহামুদ্রা সাধন নিষ্ফল।...প্রত্যহ চারিবার এই তিনটির (মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, ও মহাবেধ) অনুষ্ঠান দ্বারা ছয়মাসের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া যায়। (না. স. ই—পৃঃ ৪২৭)

মূর্ত্তিটির মুদ্রাভঙ্গীর সঙ্গে মহাবন্ধ ও মহাবেধ মুদ্রার সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো।

চিত্র—নং ১১ : গদা

একটি গদা বা মুদ্গরের অগ্রভাগ বলেই বোধ হয়। বাকী অংশ ভগ্ন হয়েছে—এমন হওয়া অসম্ভব নয়—আবার মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়ে থাকতেও পারে। গদার অবস্থিতির সঠিক কারণ নির্ণয় করা কঠিন। এই সুবৃহৎ খট্বাঙ্গ (মুদ্গর—শিবের অস্ত্র) শৈবস্থানে শৈব-অস্ত্ররূপে অবস্থিত হতে পারে। শিবের ব্যবহার্য্য মুদ্গরকে খট্বাঙ্গ বলা হয়। গদা'র চতুষ্পার্শ্বে অলঙ্করণ কৌশলে নরমুণ্ডদ্বারা বেষ্টিত করা হয়েছে। মুণ্ডগুলিতে পার্ব্বত্য জাতির মুখোসের রীতি লক্ষ্য করবার মতো। নরমুণ্ডগুলির কপালে রুদ্রাক্ষ এবং কর্ণে কুণ্ডল পরিহিত।

নাথ ধর্ম্মক্ষেত্রগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান গোরক্ষপুরের গোরক্ষ-মন্দির। "মন্দির আঙিনার বাহিরে ভীমের প্রকাণ্ড শায়িত মূর্ত্তি আছে।" (না. স. ই—পৃ: ১০৫) উড়িষ্যায় কন্‌ফট সংনাথী সম্প্রদায়ের যোগীদের মন্দিরে "মোহন্তের পরিধানে কন্থার বস্ত্র, এবং তিনি টুপী ও তৃণ নির্ম্মিত বস্ত্রাচ্ছাদিত 'সুদর্শন' নামক গদা ধারণ করেন।" (না. স. ই—পৃঃ ১০৮)। সুতরাং নাথপন্থীদের ধর্ম্মসাধনে গদা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। নৈরাত্মা মূর্ত্তিও খট্বাঙ্গ ধারণ করে থাকেন।

মূর্ত্তি—নং ১২ ও ১৩ : ত্রি-গণেশ

১২নং চিত্রে বীরাসনে উপবিষ্ট গণেশ মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ। ১৩নং মূর্ত্তিতে দুইটি গণেশ মূর্ত্তি পাশাপাশি দণ্ডায়মান। বস্তুতঃ ১২নং চিত্রের গণেশ এবং ১৩নং চিত্রের দুই গণেশ একস্থানে পাশাপাশি অবস্থিত। এই গ্রন্থে একেই 'ত্রি-গণেশ' বলা হয়েছে।

গণেশ দেবতার পূজা অতি প্রাচীন। বেদগ্রন্থে গণেশ বা গণপতি প্রধানতঃ ব্রাহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি দেবতার নামান্তর। গণপতির অপর নাম বিনায়ক। ঋক্‌বেদ ২।২৩।১৯ সূক্তে বলা হয়েছে—গণানাং ত্বা গণপতিং

হবামহে'। মূর্ত্তিভেদে গণপতির হাতে লেখনী, পুথি, অক্ষমালা, অঙ্কুশ, ফল প্রভৃতি দেখা যায়। গণেশ 'গণে'র অধিপতি। এবং 'গণ' শিব-দেবতার অনুচর। বাংলাদেশে গণপতির নৃত্যরত বহু মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। উপবিষ্ট মূর্ত্তিও অপ্রতুল নয়।

গণপতির পূজা-ধ্যানমন্ত্রে দেখা যায়, তিনি একদন্ত, খর্ব্বকায়, স্থূলতনু এবং গজ-আনন ও প্রলম্বজঠর। (অমূল্যনাথ চক্রবর্তী—ভারতে শক্তি সাধন —পৃঃ ৩০৬-৩০৭)

ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পঞ্চোপাসনা গ্রন্থে বলা হয়েছে— "পঞ্চম শতকে নির্ম্মিত কানপুরের ভিতরগাঁও নামক স্থানে পোড়ামাটির ফলকে ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ গণপতির উল্লেখ আছে।"… ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ভূমারার (মধ্যপ্রদেশ) শিব মন্দিরের ভগ্নাবশেষে গজাননের…মূর্ত্তি খোদিত পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে শিবানুচরদিগের খোদিত প্রতিকৃতি আছে। প্রায় সকলেই খর্ব্বাকার স্থূলতনু প্রলম্ব জঠর।……গণপতির মূর্ত্তি প্রায়ই চতুর্ভুজ। দ্বিভুজ, ষড়্ভুজ ও অষ্টভুজ মূর্ত্তি বিরল।" (ভা. শ. সা.—পৃ: ৩০৭-৩০৮)।

"নাথ ধর্ম্মমতে নবচক্রসাধনের নির্দ্দেশ আছে। সেই অনুসারে মূলাধারে রক্তবর্ণ 'আধারচক্র'—গণেশ ও তাহার দুই শক্তি সিদ্ধি ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠাতা।" (না. স. ই—পৃঃ ৪৪০)

আলোচ্য চিত্রে গণেশের একটি উপবিষ্ট স্থূলতনু ও প্রলম্বজঠর মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির উদরভাগের কিয়দংশ ধ্বংসের করাল গ্রাস থেকে কোনক্রমে মুক্ত হলেও ঊর্দ্ধাংশের প্রায় সবটুকুই বিধ্বস্ত। এরই পাশে দুইটি দণ্ডায়মান গজানন মূর্ত্তি। মূর্ত্তিদ্বয় বিরল দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য স্বরূপ। উভয় মূর্ত্তিই দুইদন্ত, গজ-আনন ও শীর্ণ দেহের অধিকারী এবং একমুখ বিশিষ্ট। কিন্তু প্রথম মূর্ত্তি অষ্টভুজ, দ্বিতীয় মূর্ত্তি ষড়্ভুজ। প্রথম মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বের মুখ্য ভুজদ্বয় কটিদেশে ন্যস্ত, অপর দুই হাত বক্ষের নিম্নে রক্ষিত। দক্ষিণ অংশের অপর দুই বাহু কর্ত্রি (খড়্গ বা কৃপাণ) ও শঙ্খাকৃতি অথবা ঘণ্টাকৃতি কোন বস্তু ধারণ করে আছে। বাম ভাগের

অপর দুই হস্তে খট্বাঙ্গ (ত্রিশূলাকৃতি) এবং পাশ বিধৃত। মুখের দুই পার্শ্বে দন্ত দুইটি বৃহৎ ও উন্মুখ। শুণ্ড ঈষৎ বঙ্কিমভাবে উদরের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত প্রলম্বিত। বাহুমূলে ও মণিবন্ধে রুদ্রাক্ষ-মালা।

-পার্শ্বে দণ্ডায়মান দ্বিতীয় গণেশ মূর্ত্তি পূর্ব্বের মূর্ত্তির অনুরূপ নয়। এই মূর্ত্তির মুণ্ডাংশ ভগ্ন; শুণ্ড এবং দন্তের ভগ্নাবশেষ চিহ্ন পাহাড়ের গায়ে এখনও উৎকীর্ণ আছে বোঝা যায়। এই মূর্ত্তিও একমুখ এবং দ্বিপদ। তবে ষড়্ভুজ দণ্ডায়মান এই মূর্ত্তির দক্ষিণ ভাগের তিনটি হাতের প্রথমটিতে নর-কপাল ধৃত, মধ্যম হস্তে সিদ্ধিপ্রদানের মুদ্রা বা বরদামুদ্রা ও মুখ্যভুজে নরবাহু-অস্থি সদৃশ কোন বস্তু বিধৃত। বাম ভাগের মুখ্যভুজের করতলে অক্ষমালা। উভয় পার্শ্বের মুখ্যভুজের করতলদ্বয় কটিদেশের উপর ন্যস্ত। ষড্ভুজ মূর্ত্তির সকল বাহুমূলে অক্ষমালিকা পরিহিত এবং ত্রিপুণ্ড্রক অঙ্কিত।

মূর্ত্তিটি নিঃসন্দেহে শৈব-গাণপত্য রীতির নিদর্শন। একই স্থানে বীরাসনে উপবিষ্ট গণেশ, অষ্টভুজ ও ষড়্ভুজ গণেশ সম্ভবতঃ গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছয়টি বিভাগের ছয়জন উপাস্য গণপতির মূর্ত্তি, যথা মহাগণপতি, হরিদ্রা গণপতি, উচ্ছিষ্ট গণপতি, হেরম্ব গণপতি, স্বর্ণ গণপতি এবং সন্তান গণপতি—দেবতার অন্তর্গত তিনটি নিদর্শন। (ভা. শ. সা.—পৃঃ ৩০৮-৩০৯)

হরিদ্রা গণপতি "পীত কৌষেয় বসন ও পীত উপবীতধারী। তিনি চতুর্ভুজ, ত্রিনেত্র, তাঁহার বদনমণ্ডল হরিদ্রা রঞ্জিত এবং তাঁহার হস্তে পাশ, শঙ্খ, বাণ ও অঙ্কুশ" শোভা পায়।

আলোচ্য মূর্ত্তিটি (অষ্টভুজ) যথার্থ হরিদ্রা গণপতি গোষ্ঠীর না হলেও আয়ুধগুলি সাদৃশ্যপূর্ণ। এই 'ত্রি-গণেশ' বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধনার নিমিত্ত এখানে অবস্থিত, সেই বিষয়েও সন্দেহ নেই।

মূর্ত্তি—নং ১৪ : ত্রিমূর্ত্তির পাশে রিয়াং দম্পতি

ত্রিমূর্ত্তি বা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর মূর্ত্তির কাছে পূজা-দানের উদ্দেশ্যে আগত

রিয়াং জাতির একটি দম্পতি। চাক্‌মা ও রিয়াং জাতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত। রিয়াং রমনীর ক্রোড়ে শিশুসন্তান। তার বেশ-ভূষায় কিছু আধুনিকতার স্পর্শ ঘটেছে। কিন্তু কর্ণাভরণ ও কণ্ঠের লহর-হার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী। রিয়াং যুবকের বেশ-ভূষায় আধুনিকতা লক্ষণীয়।

মূর্ত্তি—সং ১৫ : ত্রিমূর্ত্তি

সম্ভবতঃ 'ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর' এই তিন দেবতার মূর্ত্তি। তবে 'ত্রিনাথ-লিঙ্গ' মূর্ত্তি বলে মনে হয় না। এটি গুপ্তযুগের অবসান পর্ব্বে অথবা তারও কিছু পরে রচিত হয়ে থাকবে। বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যের চিহ্ন এই মূর্ত্তিগুলির নয়ন, ভ্রূভঙ্গিমা এবং ওষ্ঠাধরে স্পষ্ট। মাথার মুকুট বৌদ্ধ যুগের, বিশেষতঃ বজ্রযানী বৌদ্ধগণের মারীচী বা ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর দেবী এবং দেবতার মুকুটের অনুরূপ। গঠন ও শিল্পরীতি বৌদ্ধশিল্পকলার বিশেষ সাদৃশ্যবহ।

মূর্ত্তিত্রয়ের একটি বিষ্ণু, অপরটি মহেশ্বর এবং আর একটি ব্রহ্মার মূর্ত্তি। ব্রহ্মার এই মূর্ত্তিটিতে দীর্ঘ শ্মশ্রু ও গুম্ফরাশি বর্ত্তমান। ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর মূর্ত্তি উনকোটি তীর্থে অবস্থানের একটি সঙ্গত কারণ অনুমান করা যায়। নাথ-ধর্ম্মমতে দেহস্থিত নবচক্রসাধনার নির্দ্দেশ আছে। প্রথম 'মূলাধার চক্রে' গণেশের অবস্থান, দ্বিতীয় 'মহাপদ্ম চক্রে' নীলকণ্ঠ স্বয়ং অধিষ্ঠাতা (তন্ত্রে এর উল্লেখ নেই) ও তৃতীয় "স্বাধিষ্ঠানচক্র"—ব্রহ্মা এইস্থানে অবস্থান করেন। স্বয়ং বিষ্ণু নাভিস্থানের 'মণিপুর চক্রস্থলে' অবস্থিত।

চতুর্থ চক্র 'মণিপুরের' ঊর্দ্ধে,—তার নাম 'লিঙ্গচক্র'। তার ঊর্দ্ধে 'মনস্'—মনের স্থান এই ক্ষেত্রে। 'অনাহতের' স্থান হৃদয়ে—মহাদেব ও উমা এই স্থানে বিরাজ করেন। 'প্রাণচক্র' কণ্ঠস্থলে বিরাজিত। এই কণ্ঠচক্রে জীব ও আদ্যাশক্তির অধিষ্ঠান অথবা প্রাণনাথ ও পরমাশক্তির অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। মানবদেহে এরই নাম 'দশম দুয়ার'।

পঞ্চম চক্রের নাম 'বিশুদ্ধ চক্র'। বিশুদ্ধ চক্রের উপরে ৩২ দল পদ্ম 'অবলাচক্র'-এর দেবতা অগ্নি এবং 'ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্র' গ্রন্থির মিলনস্থানে এর অবস্থিতি অনুমিত হয়। এটি সপ্তম চক্র। [অষ্টম ও নবম চক্রের নাম যথাক্রমে 'চিবুকচক্র ও বলবান চক্র।] তন্ত্রক্ষেত্রে 'ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর' মূর্ত্তি'র ধ্যান এই কারণেই অত্যাবশ্যক রূপে বিবেচিত হয়েছে। [না. স. ই.-পৃঃ ৪৪০ থেকে তথ্য ও উদ্ধৃতি সংগৃহীত।]

মূর্ত্তি—নং ১৬ : গণেশ

আনুমানিক দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত উৎপলাচার্য্যের দ্বারা বৃহৎ সংহিতার যে ভাষ্য নির্ম্মিত হয়, সেখানে প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ের ভাষ্যে বর্ণিত আছে : একদংষ্ট্রো গজমুখশ্চতুবাহুর্বিনায়কঃ।

লম্বোদরঃ স্থূলদেহ নেত্রত্রয়াবিভূষিতঃ ॥

উপরোক্ত লক্ষণের সঙ্গে 'একদংষ্ট্রো' লক্ষণ ব্যতীত অপর লক্ষণগুলির হুবহু সাদৃশ্য আছে। তবে গ্রন্থে বর্ণিত প্রতিমালক্ষণের সঙ্গে অধুনাপ্রাপ্ত বহু মূর্ত্তিতেই কিছু কিছু মিল ও কিছু অ-মিল লক্ষিত হয়ে থাকে। সুতরাং অনুমান হয় যে, এটি গাণপত্যরীতির দ্বিতীয় শাখার 'হরিদ্রাগণপতির' মূর্ত্তি। হরিদ্রাগণপতি 'পীত কৌষেয় বসন ও পীতউপবীত-ধারী'। চতুর্ভুজ, ত্রিনেত্র, তাঁহার বদনমণ্ডল হরিদ্রা রঞ্জিত এবং তাঁহার হস্তে পাশশঙ্খ, অঙ্কুশ ও বাণ শোভা পাইতেছে। এই গণেশ মূর্ত্তি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য-[অর্থাৎ হস্তে খট্বাঙ্গ বা কুঠার বা পরশু, শঙ্খ, পাশ বা অক্ষমালা, সিদ্ধি প্রদান মুদ্রাভঙ্গী হেতু]-সহ চতুর্ভুজ, ত্রিনেত্র, স্থূলদেহ, লম্বোদর ও উপবীতধারী সাদৃশ্য গুণে, এটিকে হরিদ্রাগণপতির মূর্ত্তি বলেই অনুমান হয়।

মূর্ত্তি—নং ১৭ : পঞ্চানন

আনুমানিক পাঁচ ফুট দীর্ঘ এই মূর্ত্তিটি পঞ্চমুণ্ডের অধিকারী এবং

চতুর্ভুজ । হস্তগুলি ভগ্ন । মস্তকোপরি মুকুটের গঠন এবং কটিদেশে পঞ্চস্তরের রত্নময় বন্ধনীর গঠন কৌশল ও শিল্পকলায় গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যকলা: অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। মূর্ত্তিটি উনকোটি ক্ষেত্রে নির্মিত না-হয়ে, ভিন্ন স্থান থেকে আনীত হয়েছে—পরবর্ত্তীকালে । এটি মঞ্জুশ্রীর কোন বিবর্ত্তিত শৈব-রূপকল্পনা হতে পারে। হস্তগুলি ভগ্ন হওয়ায়,—প্রচলিত কোন পঞ্চানন-শিবমূর্ত্তি বলে নিঃসন্দেহে মত প্রকাশ করা যায় না । কারণ হস্তধৃত আয়ু বা বস্তুনিচয়ের সম্যক পরিচয় লাভ এখন দুঃসাধ্য ।

মূর্ত্তি—নং ১৮ : হনূমান

এটি হনূমানের মূর্ত্তি । হস্তদ্বয় ভগ্ন হয়ে গেলেও তাদের অবস্থানভঙ্গী: ভগ্নাবশেষ থেকেই নির্দ্ধারণ করা যায় । হনূমানের কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ অথবা অন্য কোন বস্তুর মালিকা পরিহিত । বাম হস্ত ঈষৎ বঙ্কিমভাবে বক্ষের সন্নিকটে স্থাপিত, দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত । উত্থিত হস্তের করতলের উপরে একটি ভগ্ন প্রস্তরাংশ । এটি গন্ধমাদন পর্বত ছিল কিনা বলা কঠিন। গন্ধমাদন পর্ব্বতবাহী হনূমানের মূর্ত্তির পশ্চাতে স্বভাবতঃই রামায়ণের প্রভাব, ফলতঃ আর্যহিন্দুধর্ম্মের প্রভাব অনুমান করা যেতে পারে । মূর্ত্তিটির কটি দেশে ক্ষীণ বস্ত্রখণ্ড ব্যতীত সমগ্র দেহ অনাবৃত । পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে রক্ষিত দ্বিচক্রশোভিত একটি প্রস্তরখণ্ড হনূমান মূর্ত্তির অন্তর্গত নয় । কোনও স্তম্ভ-শীর্ষের খণ্ডিত অংশ স্থানীয় পার্ব্বত্য জাতির পুরোহিতগণ পরে স্থাপনা করেছেন ।

দীর্ঘ লাঙ্গুলে একটি পিণ্ডাকার বস্তুকে জড়িয়ে রাখা,—মূর্ত্তিটির সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র ও বিস্ময়কর লক্ষণ ।

উনকোটিতে হনূমানের মূর্ত্তির উপস্থিতির হেতু-নির্দ্দেশ কঠিন নয় । 'নাথ-সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার' মধ্যে হনূমানের একটি স্থান আছে। ডঃ কল্যাণী মল্লিক নাথযোগীদের সম্বন্ধে বলেছেন—"যোগীরা প্রধানত শৈব, কিন্তু ধীনোধরের মঠে ধর্ম্মশালায় বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে । গোরক্ষমন্দিরের

সাইত হনুমান, রামচন্দ্র, কালী প্রভৃতিরও মন্দিরে দেখা যায়।" [না. স. ই.-পৃঃ ১০৮]

শিবভক্ত হনূমানকেও পরমযোগী বলা হয়। যোগসিদ্ধ রূপে হনূমানের খ্যাতি, রামায়ণে (কৃত্তিবাসের) আছে। যোগবলে হনূমানকে বহুপ্রকারের অলৌকিক ক্রিয়াসাধনে রত দেখা গেছে। "সিদ্ধেরা যে মৃত্যুঞ্জয়ী হইতেন একথা সন্তেরাও স্বীকার করেন—

দও গোরখ হণবন্ত প্রহ্লাদ
সাস্ত্রো পড়িএ ন মুনিয়ে সাধ
মারে মরে ন সিদ্ধ সরীর
কৃষ্ণ কাল্‌বসি একহি তীর।

অর্থাৎ দত্তাত্রেয়, গোরক্ষ হনূমান প্রহ্লাদ শাস্ত্রজ্ঞ না হইয়াও অমরত্ব লাভ করেন, কিন্তু কৃষ্ণ এক বাণেই মৃত হন।" (না. স. ই.—পৃ: ৪৩৩)

বিভিন্ন স্থানের গোরক্ষ মন্দিরে হনূমানের মূর্ত্তি দেখা যায়। বঙ্গদেশে (দমদম) গোরক্ষ মন্দিরের বিপরীতে শিব-মন্দিরেও হনূমান মন্দিব আছে। গোরক্ষপুরের গোরক্ষমন্দিরের আঙ্গিনায় দক্ষিণদিকে হনূমান ও উত্তরে পশুপতিনাথের মন্দির। সুতরাং হনূমান নাথধর্ম্মে বিশেষভাবে আদৃত।

হনূমান, নাথধর্ম্মে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। হনূমানের লাঙ্গুলে বিজড়িত পিণ্ডাকার বস্তু সম্ভবতঃ নাথধর্ম্মের পিণ্ডতত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নাথধর্ম্মের প্রধান কথা দেহ-সাধনা এবং রসায়ন-পরতন্ত্রতার সাহায্যে দেহসিদ্ধি। দেহতত্ত্বই অপরপক্ষে পিণ্ডতত্ত্ব। পিণ্ড বা দেহকে আশ্রয় করেই তাঁদের ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধনার তত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে। পিণ্ডমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা এবং পিণ্ড-সংবেদন অর্থে পিণ্ডের বোধ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তার অনুভব। "সিদ্ধসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে উক্ত হইয়াছে—

ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তি যৎকিঞ্চিৎ তৎ পিণ্ডেহপ্যাস্তি সর্ব্বথা।
ইতি নিশ্চয় এবাত্র পিণ্ড-সংবিত্তিরুচ্যতে॥

[না. স. ই.—পৃ: ৩২০]

মানবদেহ বা পিণ্ডের উৎপত্তি মূলাধার থেকেই। যোগমার্গে সাধনার মূলও এই মূলাধার থেকেই সুরু।

তন্ত্রমার্গে পিণ্ডশুদ্ধি বা দেহশুলির দ্বারা সিদ্ধদেহ লাভের জন্য তান্ত্রিকগণ 'রস'-এর ব্যবহার-বিধির উল্লেখ করেছেন। 'রস' অর্থাৎ পারদ দ্বারা দেহসিদ্ধি লাভের প্রক্রিয়া তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন। পারদসহ অভ্রক ও গন্ধকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।" [না. স. ই.—পৃ : ৫২১]

যোগক্ষেত্রে হনুমান, বৈজ্ঞানিক ও রসায়ন ব্যাখ্যায় লব্ধ সিদ্ধান্তের প্রতীক স্বরূপ। "কপ্যাস পুণ্ডরীকের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—'কপিঃ মর্কটঃ আস্যতে-উপবিশ্যতি অনেন—কপেঃ পুচ্ছাধঃস্থানম্।"......

'কপি' শব্দের আক্ষরিক বীজগত অর্থ হইল—ক (কামনা), প (বুদ্বুদ সৃষ্টির প্রথম আভাস), ই (গতি); অর্থাৎ কামনা উন্মেষের প্রথম উন্মাদনা বা thrill. কামনা উপজাত হইয়া অন্যভাবে বহিঃপ্রকাশ হইবার সময় শরীর কম্পিত হয়, কিন্তু কামনার উন্মেষ হইবার সময় যে সূক্ষ্ম কম্পন হয়, তাহাই কপি, এবং মর্কটের দেহে সর্ব্বদা সেরূপ সূক্ষ্মগতি কম্পন বিদ্যমান আছে বলিয়াই তাহার নাম কপি। সেইজন্য কপি বায়ুপুত্র।......... সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের 'কপে: পুচ্ছাধঃস্থানম্' অর্থে বাস্তব মর্কট বুঝিলে চলিবে না।" [উপনিষদে সাধন রহস্য—পৃ : ১১১-১১২-১১৩]

হনুমান মূর্ত্তির লাঙ্গুল দেশে পিণ্ডাকার বস্তু বিজড়িত থাকার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ লক্ষ্য করা যায়। ড: কল্যাণী মল্লিক এই বিষয়ে বলেন—'নাদানুসন্ধান এবং ওঁকার সাধন যোগসাধনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গবিশেষ। মুক্তিলাভের দুইটি পন্থা—সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি বা 'বিহঙ্গমার্গ' ও 'পিপীলিকামার্গ'।.........পিপীলিকামার্গে অষ্টাঙ্গ হঠযোগ সাধনে অনিমাদি সিদ্ধিলাভ করতঃ যোগী উত্থানপতনের বিবর্ত্তনে বারংবার জন্মলাভ করিয়াছেন। ক্রমবিকাশ দ্বারা একজন্মেই স্ব-স্বরূপে অবস্থান সম্ভব নয়,—ইহাই 'পরমপদে পিণ্ডলয়' বা 'সমরসীকরণ'। এই ক্রম দুইটিকে 'মর্কটক্রম' এবং 'কাকমত' বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে।" (না. স. ই. -পৃ : ৫৭৬)। (যোগশিখোপনিষদ ১৪০-১৪৩ শ্লোক, যোগবীজ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

চিত্র—নং ১৯ : চাক্‌মা সম্প্রদায়

চাক্‌মা জাতির কয়েকজনের সঙ্গে করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক শ্রীমাণিক সাহা। উনকোটি ক্ষেত্রে চাক্‌মা সম্প্রদায় শিবের পূজা দিতে আসে।

মূর্ত্তি—নং ২০ : হর-পার্ব্বতী

উমা-মহেশ্বর বা হর-পার্ব্বতী মূর্ত্তি। পালপর্ব্বের হরপার্ব্বতী মূর্ত্তি বলেই অনুমিত হয়। গঠন কৌশল ও শিল্পরীতি বহু পরিচিত পালরাজত্বের কালে পরিকল্পিত উমা-মহেশ্বর মূর্ত্তিকেই স্মরণ করায়।

সহজিয়া সাধক লুইপাদের সাধন-পদ্ধতিতে ভ্রূযুগলের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে ইড়া-পিঙ্গলার সঙ্গম স্থলে পদ্মাসনে সমাসীন নিজ গুরুর ধ্যান করার একটি রীতি লক্ষিত হয়। পরবর্ত্তীকালে রচিত ঘেরণ্ড সংহিতা এবং বিশ্বসারতন্ত্রেও এই গুরু ধ্যানের বর্ণনা আছে। আরও পরে রচিত কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে, আজ্ঞাচক্রের স্থলে গুরুর বাম উরুভাগে সুখাসনে উপবিষ্টা গুরুপত্নীর ধ্যানের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। [না. স. ই.—পৃঃ ৬৬ অনুসরণে] নাথ সম্প্রদায়ে যদিও ধ্যানের রীতি অনুরূপ নয়—তবু শিব ও শক্তি বা হর-পার্ব্বতীর ধ্যান নাথধর্ম্মে অবশ্য আচার্য্য। হিন্দু ও সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয়ে কোন নব ধ্যান কল্পনা সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়।